বঙ্গ-বিজয়

বা

ভিষক-দুহিতা।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়-প্রণীত।

—*—

কলিকাতা।

প্রিণ্টার্স—মেসার্স মুখার্জ্জি এণ্ড চাটার্জ্জি

মেট্‌কাফ্ প্রেস, ৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট্।

মূল্য ১ [illegible] ার আনা মাত্র।

ত্রিপুরা, ইব্রাহিমপুর হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

প্রথম খণ্ড।

পরিচয়।

And pledging oft to meet again,
We tore ourselves asunder ;—

R. BURNS.

মুখবন্ধ।

গ্রন্থারম্ভের পূর্ব্বেই একটা দুঃখের কথা বলি।

আমরা যে সময়ের কথা বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সে সময়কার ইতিহাসের বড় অভাব। বাঙ্গালী কখনও ইতিহাসানুরাগী নহে—কখনও ইতিহাস লিখিতে যত্ন পায় নাই। তাই আজ স্বদেশের কথা লিখিতে যাইয়াও আমাকে টমাস সাহেবের * নিকট হইতে কিছু ধার গ্রহণ করিতে হইয়াছে। টমাস সাহেব বড়লোক। তাঁহার নিকট ধার গ্রহণ করিতে আমার লজ্জা নাই। কিন্তু স্বদেশী মহাজন থাকিতে বৈদেশিকের নিকট ঋণ গ্রহণ করিতে হইল, ইহা পরিতাপের বিষয় বটে। টমাস সাহেব যে অমানুষিক পরিশ্রম স্বীকার করিয়া তাঁহার মুদ্রা বিষয়ক গ্রন্থে ভারতের ইতিহাসের গবেষণা করিয়া গিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসার্হ, এবং সেজন্য ভারতবাসীকে চিরকাল তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিতে হইবে। স্বদেশের যে গুরুতর অভাব দেশের লোকে দূর করিতে পারে নাই, টমাস সাহেব বিভিন্ন রীতিনীতিসম্পন্ন বৈদেশিক ব্যক্তি

---

* Thomas Edwards (author of *The Coinage of Bengal*, etc.)

হইয়াও সে অভাব পূরণ করিয়াছেন, একথা একেবারে উপেক্ষণীয় নহে। দুর্ভাগ্যবশতঃ এরূপ দৃষ্টান্ত ভারতের ইতিহাসে নিতান্ত বিরল নহে। রাজস্থানের ইতিবৃত্ত-লেখক মহাত্মা টড্ সাহেবের ভারতে শুভাগমন না হইলে আর্য্যজাতির গৌরব ও মাহাত্ম্য আজ কতটা হীন ও নিষ্প্রভ হইয়া থাকিত, তাহা একবার বুঝিয়া দেখ দেখি? কে জানে ভারতের কত দেশের কত কত গৌরব-কাহিনী একমাত্র এই উপযুক্ত পরিশ্রম ও অনুসন্ধিৎসাবৃত্তির অভাবেই আজ জগতের সম্মুখ হইতে লুপ্ত কিনা—কে জানে আমাদের ভাগ্য-চিত্র উপযুক্ত স্মরণলিপি থাকিলে আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিত কিনা? আমাদের যেরূপ পিতৃপুরুষের গৌরব ছিল, তেমন আর কাহার আছে? আমাদের যেরূপ শোচনীয় পরিণাম হইয়াছে, এমনই বা আর কাহার দেখিতে পাও? কেন এরূপ হইল? কেন আকাশ হইতে পাতালে পড়িলাম, কেন স্বর্গ হইতে নরকে ডুবিলাম, কেন দেবতার প্রসাদ কুকুরের পদতলে মর্দ্দিত হইতে গেলাম? তাহার উত্তরে একটা কথা লক্ষ্য কর। দেখ, যাহার কিছুই নাই, তাহাকেই পেটের দায়ে ভরণপোষণের সংস্থান করিতে হয়, উপার্জ্জন করিতে হয়—সেই আত্মরক্ষা করিতে পারে; আর যাহার যথেষ্ট পৈতৃক সম্পত্তি আছে, পেটের জন্য চিন্তা করিতে হয় না, তাহাকেই মূর্খ হইতে হয়, সেই ক্রমে ক্রমে সমস্ত খোয়াইয়া ভিখারী সাজে আমাদেরও কতকটা সেই অবস্থা ঘটিয়াছে। আমরা মনে করি, বেদ, উপনিষদ, দর্শন, জ্যোতিষ, আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি আমাদের যাহ কিছু পৈতৃক সম্পত্তি আছে, তাহা অক্ষয়, অব্যয়,—তাহাই যথেষ্ট ইহার উপর কোন কালে কোন কারণে আমাদের আর কিছু আবশ্যক হইবে না, হইতে পারে না। এগুলি রাখিয়া খাইতে পারিলেই

যথেষ্ট হইল! এই সিদ্ধান্ত হইতেই দেখ আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। বহুদিন পুকুরে একই জল আবদ্ধ থাকিলে তাহা যে ক্রমে ক্রমে শৈবালরাশিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, ভিতরে পরিষ্কার পানীয় থাকা সত্ত্বেও যে আর ব্যবহার করা যায় না, এবং সেই পুকুরকে ব্যবহারোপযোগী করিতে হইলে যে স্থানান্তরাগত স্রোত-বারির আবশ্যকতা হয়, একথা আমাদের মোটেই মনে হয় না। আমাদের অমূল্য পৈতৃক সম্পত্তিগুলিকে মাজিয়া ঘসিয়া ব্যবহারোপযোগী করিতে হইলে যে দেশকালপাত্র বিবেচনায় বর্ত্তমান সভ্যতার সংস্পর্শে পূর্ণতর করিয়া লইতে হইবে, সেকথা আমরা স্বপনেও ভাবি না। যদি আমরা এই পৈতৃক সম্পত্তির গর্ব্ব ভুলিয়া গিয়া ক্রমে ক্রমে দেশের কাহিনীগুলি রক্ষা করিয়া রাখিতাম, তাহা হইলে আজ এই অধঃপতিত জাতিকে 'ন অন্নং ন বস্ত্র' হইতে হইত না, আর তাহা হইলে আজ আমাকেও স্বদেশী মহাজন পরিত্যাগ করিয়া বিদেশীর নিকট ঋণ গ্রহণার্থ যাইতে হইত না। হয়ত, এ আখ্যায়িকারই অবতারণা করিতে হইত না। কিন্তু যাহা হইয়াছে, তাহার জন্য আর বেশী আক্ষেপ করিয়া ফল কি? ভবিষ্যতে যাহা হইবে, তাহার জন্য সতর্ক হইলে লাভ আছে, আর সেজন্যই এত কথা বলা প্রয়োজনীয় মনে করিলাম। এখন যাহা বলিতেছিলাম, তাহাই বলিতেছি।

বঙ্গ-বিজয়।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—*—

অভিমান-বহ্নি।

And dost thou now fall over to my foes?

Shakespeare.

বখতিয়ার খিলিজি গৌড় ও নবদ্বীপ অধিকার করিলে পর হিন্দু নরপতিগণ সুবর্ণগ্রামে যাইয়া শতাধিক বর্ষকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুবর্ণগ্রামের যে স্থলে তাঁহাদের রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার নাম—কুমারসুন্দর। কিন্তু সচরাচর সে স্থানও নগর সোনারগাঁ বলিয়াই কথিত হইত। এই নগর সোণারগাঁর কোন

একটী অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন মহল্লায় একজন ধনাঢ্য শ্রেষ্ঠী বাস করিতেন। তাঁহার নাম—নয়নচাঁদ।

নয়নচাঁদের অগাধ সম্পত্তি—অতুল বৈভব। কিন্তু শরীরে যাহার সুখ নাই, অর্থে তাহার কি হইবে? শ্রেষ্ঠীর সব ছিল, কিন্তু স্বাস্থ্য ছিল না। অনেকদিন যাবত রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া শেষটা নয়নচাঁদ শয্যা লইয়াছিলেন—তাঁহার জীবন-প্রদীপ দিন দিন ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল।

সুবর্ণগ্রামে শ্রেষ্ঠীকে সকলেই চিনিত। যাঁহার অগাধ সম্পত্তি তাঁহাকে কে না চেনে? বিশেষ নয়নচাঁদের পুত্র সৈনিক বিভাগে কার্য্য করিয়া বড়ই যশস্বী হইয়া উঠিয়াছিল—লোকে বলিত, তেমন যোদ্ধা সেকালে সুবর্ণগ্রামে বড় দেখা যাইত না। কাজেই শ্রেষ্ঠীর পীড়ার সংবাদে নগরে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। কত বৈদ্য আসিল, সন্ন্যাসী আসিল, কিন্তু কেহই কিছু করিতে পারিল না—এমন কি রোগই নির্ণীত হইল না।

ছোট বড় আরও অনেকে দেখিতে আসিল। আত্মীয় আসিল, অনাত্মীয় আসিল, শত্রুও কেহ কেহ আসিল। যে আত্মীয়, দুঃখ প্রকাশ করিল; অনাত্মীয়ও দুঃখ প্রকাশ করিল; শত্রু যে, সে কিছুই বলিল না—কেবল যাইবার সময় মনে মনে কহিল, "পাপে ধরিয়াছে—তাই চিকিৎসায় ফল দর্শিতেছে না।" দেনাদার, পাওনাদার উভয়েই আসিল। যে পাওনাদার তার বিশেষ ভাবনা নাই—সৎপুত্র জীবিত থাকিলে অবশ্য ঋণ শোধ দিবে; কিন্তু যে দেনাদার তার ভাবনা অসীম—যদি আবার বুড়া বাঁচিয়া উঠে।

কিন্তু এতলোক আসিল—আসিল না কেবল একজন। তাহার নাম—বেণীপ্রসাদ। সহস্রের ভিতর একজন না আসিলে বড়

বিশেষ কিছু আসে যায় না। কিন্তু বেণীপ্রসাদের মত একজন না আসিলে, সে স্বতন্ত্র কথা। সহস্র জন আসিয়া যাহা করিতে পারে নাই, লোকের বিশ্বাস ছিল, এক বেণীপ্রসাদ আসিলেই তাহা করিতে পারিত। বেণীপ্রসাদ রাজবৈদ্য, ধন্বন্তরি-তুল্য লোক! চিকিৎসা-ব্যবসায়ে তাঁহার অগাধ বহুদর্শিতা। সকলেই অনুমান করিত, বেণীপ্রসাদ আসিলে নয়নচাঁদের রোগ নিশ্চিত আরোগ্য হইত। কিন্তু নয়নচাঁদ কখনও তাঁহাকে ডাকিলেন না—বেণী-প্রসাদও নিজ হইতে আসিল না।

কেন এরূপ হইল, তাহার একটা কারণ ছিল। বেণীপ্রসাদ যে ভুলক্রমে বা দৈবচক্রে আসিতে পারিল না, তাহা নহে। নয়নচাঁদ যে তাঁহার অভিজ্ঞতায় বিশ্বাস করিতেন না, এমনও নহে। কথাটা এই, তাঁহাদের মাঝখানে একটা মনোমালিন্য ছিল। সে মনো-মালিন্য কি, কেন ঘটিয়াছিল তাহা কেহ জানিত না—তবে সে যে একটা ভারি রকম ঝগড়া, তাহা সকলেই বুঝিত। উভয়ে উভয়ের মুখ-দর্শন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিল।

কিন্তু চিকিৎসকের সঙ্গে আড়ি করিয়া চলে না। নয়নচাঁদ ত কিছুতেই বেণীপ্রসাদকে ডাকিলেন না; কিন্তু তাঁহার পুত্র বিজয়-চাঁদ—সে পিতৃভক্ত বালক—সে দেখিল, পিতার জীবন আর রক্ষা পায় না, জীবনপ্রদীপ দিন দিন ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। সে একদিন সাহস করিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, একবার বেণী-প্রসাদকে ডাকিলে হয় না?" নয়নচাঁদ একটু অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন। কহিলেন "ছি, বাবা, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি—এখন মরিলেই বাঁচি। আমার জন্য এত চিন্তা কেন? এখন যাহাতে আমার মান সম্ভ্রম বজায় রাখিতে পার, সেই চেষ্টাই দেখ।"

বিজয়চাঁদ আর অধিক কিছু বলিতে সাহসী হইল না। তাহার মা নাই—পিতৃস্নেহই তাহার সকল। পিতার অভাব হইলে কিরূপে থাকিবে, একথা সে ভাবিতেও পারিত না। কিন্তু তাহার হৃদয়েও একটা দারুণ অভিমান-বহ্নি প্রজ্বলিত ছিল। সেও মনে মনে কহিল, "না, যা হইবার হউক, সুখশান্তি চাই না; মান থাক্, সম্ভ্রম থাক্, সেই ভাল। ঈশ্বর করেন ত, পিতা অম্নি অম্নি আরোগ্য হইবেন।"

কিন্তু আশার এই ক্ষুদ্র আলোক অধিকদিন স্থায়ী হইল না। হঠাৎ একদিন শ্রেষ্ঠীর অবস্থা বড় শোচনীয় হইয়া পড়িল। জীবন আর রক্ষা পায় না। বিজয়চাঁদ তখন চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—*—

নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ।

At length, his transient respite past,
His comrades, who before
Had heard his voice in every blast,
Could catch the sound nomore ;
For then, by toil subdued, he drank
The stifling wave, and then he sank.

W. Cowper.

সন্ধ্যাকাল। সন্ধ্যার আঁধার চারিদিক ঘেরিয়া ফেলিতেছিল। সেই সঙ্গে কোথা হইতে আর একটা অজ্ঞাতরাজ্যসম্ভূত ভীষণ

বিষাদময় ভাব আসিয়া, শ্রেষ্ঠীর সুরম্য আবাসবাটিকাটী বড়ই অন্ধকারময় করিয়া তুলিয়াছিল। এই উভয় আঁধার বুকে লইয়া একটী অষ্টাদশবর্ষীয় সুন্দর যুবক ও তৎপার্শ্বে আর একটী ত্রয়োদশ-বর্ষীয়া বিষাদপ্রতিমা নির্ণিমেষ নয়নে মুমূর্ষু শ্রেষ্ঠীর মুখখানার প্রতি চাহিয়াছিল—চাহিয়া, চাহিয়া, চাহিয়া, মৃদুমারুতসঞ্চালিত শিশির-সিক্ত কুসুমবৎ কেবলি অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিল।

বালক—বিজয়চাঁদ। বালিকা তাহার ভগিনী—পান্না।

রোগী কতক্ষণ চুপ করিয়া নিদ্রা যাইতেছিল, হঠাৎ অবস্থার বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইল। নয়নচাঁদ সহসা যাতনায় এ পাশ ও পাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার আর কথা কহিবার শক্তি ছিল না—বালক-বালিকা অনেক প্রশ্ন করিয়াও উত্তর পাইল না। একজন বৈদ্য অদূরে দেয়ালের নিকটে ক্ষুদ্র আসনে বসিয়া ঘন ঘন রোগীর প্রতি লক্ষ্য রাখিতেছিলেন, তিনি এখন উঠিয়া নিকটে আসিলেন। নিকটে আসিয়া একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন; তার পর নাড়ী স্পর্শ করিলেন।

নাড়ী দেখিয়া চিকিৎসক বড় ভীত হইলেন। জীবনীশক্তি বড় ধীরে ধীরে বহিতেছে। তাঁহার মুখমণ্ডল বড় গম্ভীর হইল। তিনি ধীরে ধীরে কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন।

যতক্ষণ চিকিৎসক রোগীর অবস্থা লক্ষ্য করিতেছিলেন, ততক্ষণ বালক-বালিকা একদৃষ্টে তাহার মুখপ্রতি চাহিয়াছিল। চিকিৎসক গৃহের অন্তরাল হইলে, চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া বালিকা কহিল, "ভাই, কি দেখিতেছ, আমাদের বুঝি সর্ব্বনাশ হইতেছে।"

যুবকের চক্ষেও উদ্বেগের চিহ্ন প্রকটিত হইতেছিল। পরিচারিকা

ও পরিচারকদিগকে রোগীর নিকট বসিতে ইঙ্গিত করিয়া তিনিও সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

গৃহের বাহিরে আর একটী প্রশস্ত কক্ষে বসিয়া সুবর্ণগ্রামের শ্রেষ্ঠ বৈদ্যগণ পীড়িতের অবস্থা আলোচনা করিতেছিল। যুবক তথায় উপস্থিত হইয়া কহিল, "মহাশয়, আমি পিতৃহীন হইতে যাই-তেছি। আপনাদের ভিতর কি এরূপ কেহই নাই, যিনি আমার পিতাকে এ যাত্রা প্রাণদান করিতে পারেন? আমি প্রতিশ্রুত হইতেছি, সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক দিব।"

কথা কহিতে কহিতে যুবকের চক্ষু সলিলভারাবনত স্থলপদ্মবৎ সিক্ত হইয়া উঠিল। চিকিৎসকগণের মধ্যে যিনি প্রবীণ তিনি সস্নেহে উত্তর করিলেন, "বৎস, জীবন-মরণ মনুষ্যের ইচ্ছাধীন নহে। বাঁচনমরণ শুভাশুভের অধিকারী একমাত্র ভগবান—চিকিৎসক ত উপলক্ষ মাত্র। তথাপি মানবকে চেষ্টার ক্রটী করিতে নাই। আমাদের যাহা সাধ্য, তাহা করিয়াছি। এই বেলা শেষ চেষ্টা, রাজবৈদ্যকে সংবাদ দেওয়া। এতদ্ব্যতীত অন্যোপায় দেখিতেছি না।"

চিকিৎসকের কথা শ্রবণ করিয়া যুবক কতক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার দৃষ্টিতে এক ব্যাকুলতা ও নৈরাশ্যের ভাব প্রকটিত হইল। তাহাকে তদবস্থায় নীরব থাকিতে দেখিয়া বৈদ্য পুনরপি কহিলেন, "বালক, এখনও কি অভিমান রাখিতেছ? পূর্ব্বকথা বিস্মৃত হও। চিকিৎসক কখনও রোগীর শত্রু হয় না—তুমি ইহাতে দ্বিধা বোধ করিও না।"

তখন যুবক কহিল, "মহাশয়, মরণবাঁচন যদি মনুষ্যেরই সাধ্য নহে, তবে তাঁহাকে ডাকিলেই বা অধিক কি ফল দর্শিবে?"

চি। বৎস, তুমি যাহা কহিতেছ, তাহা একবারে অমূলক নহে; কিন্তু উপলক্ষ ভিন্নই বা জগদীশ্বরের কোন্ উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া থাকে? রাজবৈদ্য স্বয়ং ধন্বন্তরি বলিয়া খ্যাত—হয়ত, তাঁহার মর্য্যাদা রক্ষার জন্য, ঈশ্বর তাঁহার দ্বারাই তোমাকে বিপন্মুক্ত করাই-বেন, এরূপ মানস করিয়াছেন।

যু। কিন্তু সম্পদে যাহার সঙ্গে প্রীতি নাই, বিপদে পড়িয়া কিরূপে তাহার শরণ লইব?

চিকিৎসক ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন "তুমি বালক, তাই এখনও অভিমান ত্যাগ করিতে পারিতেছ না। সংসারে মিলনের সুযোগ অতি দুর্ল্লভ—তাহা কখনও পরিত্যাজ্য নহে। সংসারে আমরা মিলনের জন্যই আসিয়াছি—কলহের জন্য নহে। আজ তুমি কলহের পর মিলনের সুযোগ পাইয়াছ, এ সুযোগ পরিত্যাগ করিও না।"

যু। আপনার কথা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু পিতার অনভিমতে কিরূপে আমি এ কার্য্য করিব? পিতা কিছু-তেই এ কার্য্যে সম্মতি দিবেন না।

চি। তোমার পিতা রুগ্ন—ঈশ্বরেচ্ছায় তাঁহার ভার এখন তোমার উপর। তুমি যাহা করিবে, তাঁহাকে তাহাতেই স্বীকৃত হইতে হইবে। বিশেষ তাঁহার এখন সংজ্ঞা মাত্র নাই। তুমি এখনই বেণীপ্রসাদের নিকট গমন কর।

তখন যুবক কথাটা আরও ভাল করিয়া চিন্তা করিল। বৃদ্ধের বাক্যের সারাংশ তাহার চিন্তাভারাক্রান্ত অন্তরে প্রতিধ্বনি করিল কি না তাহা আমরা অবগত নহি। কিন্তু তাহার দুর্দ্দমনীয় অভিমান সেই কথা কয়টীর পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই অনেকটা ম্লান হইয়া

গেল, এবং এক অন্যমনস্ক নিস্তব্ধভাব আসিয়া তাহাকে কয়টী ক্ষুদ্র মুহূর্ত্তের জন্য অভিভূত করিয়া রাখিল।

তাহাকে তদবস্থায় নীরব থাকিতে দেখিয়া চিকিৎসক পুনরপি কহিলেন, "শাস্ত্রে আছে, 'আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি'। যে জীবন ঈশ্বরপ্রদত্ত, মানুষের তাহা নষ্ট করিবার অধিকার নাই। যতক্ষণ প্রাণ রক্ষার ক্ষমতা আছে, ততক্ষণ উহা রক্ষা করিতেই হইবে—সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও রক্ষা করিবে। নতুবা আত্মহত্যার পাপ স্পর্শিবে। দেখ, তোমার নিজ জীবনাপেক্ষাও মূল্যবান পিতৃজীবন এখন তোমার হাতে। তাঁহার ভালমন্দ এখন তোমাকেই বিচার করিতে হইতেছে। দেখিও, ভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়া যেন পিতৃহত্যা করিও না। মানব যতক্ষণ সুস্থ, ততক্ষণই তাহার কথা গ্রাহ্য। অসুস্থাবস্থার বিকৃতাদেশ পিত্রাদেশ হইলেও কদাপি পালনীয় নহে।"

যুবক আর সে স্থানে অপেক্ষা করিল না। কক্ষান্তরে গমন পূর্ব্বক স্বীয় পরিধান গ্রহণ করিল। তার পর সপ্তমীর ক্ষীণচন্দ্রকরালোকিত রাজপথে অবতরণ পূর্ব্বক সেই আঁধার ও আলোকের মিশ্র জ্যোতিতে পথ দেখিতে দেখিতে নগরের বহির্দ্দিগ্‌পানে ছুটিয়া চলিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—*—

ভিষকের প্রতিশোধ।

Why do you bend such Solemn brows on me ?
Think you I bear the shears of destiny ?
Have I commandment on the pulse of life ?

King John.

যুবক অনেক দূর গেল। রাজপথের পর রাজপথ, গলির পর গলি, পুকুর, মাঠ, বাড়ী, ঘর অনেক উত্তীর্ণ হইয়া সর্ব্বশেষ এক আম্রকাননে উপস্থিত হইল। এই কাননমধ্যে বেণীপ্রসাদ বাস করিতেন।

কাননমধ্যে বড় অন্ধকার—ঘন পত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষের শাখা-প্রশাখায় বাধাপ্রাপ্ত হইয়া চন্দ্ররশ্মি কিছুতেই ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিতেছিল না। বিজয় তীব্র দৃষ্টিতে সেই ঘনান্ধকার ভেদ করিয়া যাইতে লাগিল। তাহার দ্রুত পদক্ষেপে শুষ্ক পত্রগুলি ক্রমাগত মর্ম্মর ধ্বনি করিতে লাগিল। কথনও কথনও শুষ্ক শাখা-প্রশাখা তাহার চরণে বিদ্ধ হইতে লাগিল। তাহাতে চরণতল ক্ষত হইয়া কোথাও কোথাও শোণিতস্রাব হইল। কিন্তু বিজয়ের সে দিকে লক্ষ্য নাই। তাহার অন্তরে তখন কেবলই মুমূর্ষু পিতার ক্লিষ্ট মুখখানি জাগরিত হইতেছিল। পিতার পবিত্র মূর্ত্তি হৃদয়ে দর্শন করিতে করিতে বিজয় এ সকল দৈহিক ক্লেশ নীরবে উপেক্ষা করিয়া চলিতে লাগিল।

এইরূপ ভাবে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া যুবক দেখিল, অদূরে জীর্ণ

শীর্ণ অট্টালিকা বনমধ্যস্থ মুক্ত ভূমিতে চন্দ্রকরমণ্ডিত হইয়া শোভা পাইতেছে। তাহার দ্বিতলস্থ একটী কক্ষ হইতে একটী উজ্জ্বল দীপরশ্মি বহির্গত হইয়া রাত্রির অন্ধকার ভেদ করিয়া আকাশ-পানে ছুটিয়া চলিয়াছে। মরুভূমে দূর হইতে জলাশয় দেখিতে পাইলে পথিক যেমন লম্ফ প্রদানে সেই দিকে অগ্রসর হয়, বিজয়ও তেমনি দ্রুতগতিতে অবশিষ্ট কানন-পথ অতিক্রম করিয়া দুই লম্ফে অট্টালিকার সমীপবর্ত্তী হইল।

অট্টালিকার দ্বারে উপস্থিত হইয়া বিজয় দেখিল, ফটকে বসিয়া প্রহরী ডান হস্তের তালুতে সিদ্ধি রাখিয়া বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি-সহযোগে মর্দ্দন করিতেছে। প্রহরীকে ভিতরে পাঠাইয়া যুবক রাজ-বৈদ্যকে সংবাদ দিল। কিছু পরে প্রহরী ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "মনিব অপেক্ষা করিতেছেন, আপনি প্রবেশ করিতে পারেন।"

তখন যুবক গৃহে প্রবিষ্ট হইল। অট্টালিকাটি বাহিরে যতটা জীর্ণ শীর্ণ বলিয়া বোধ হইতেছিল—ভিতরে ততটা নহে। ভিতরের দেওয়ালগুলি বেশ পরিষ্কার—চূণকাম করা। বিজয় প্রবেশ করিয়াই সম্মুখে সরু পথ পাইলেন। পথের পরই প্রাঙ্গণ—প্রাঙ্গণের পর পুনঃ অট্টালিকা। সেই অট্টালিকার একটী বিস্তীর্ণ কক্ষে একটী উজ্জ্বল আলোক চারিদিক উদ্ভাসিত করিয়া জ্বলিতেছিল। যুবক সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন, প্রজ্বলিত দীপশিখাসন্নিকটে পালঙ্কোপরি বসিয়া একটী কুটিলনেত্র প্রশান্ত-বদন শ্বেতশ্মশ্রুবৃদ্ধ অবনতমস্তকে তালপাতানির্ম্মিত ক্ষুদ্র পুথি অতি মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিতেছেন।

যুবককে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বৃদ্ধ পুস্তক বন্ধ করিয়া নেত্র উত্তোলন করিলেন। তার পর একবার ধীরে ধীরে চক্ষু মার্জ্জনা

করিয়া কুটিল হাস্য-সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি বাপু, তোমার নাম বিজয়চাঁদ না ?"

বৃদ্ধের বয়স প্রায় সত্তর বৎসর হইবে। কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দেহ অবসন্ন হইয়া পড়ে নাই। এখনও শরীরে যথেষ্ট শক্তি-সামর্থ্য লক্ষিত হইতেছিল। গায়ের রং উজ্জ্বল গৌরবর্ণ; মুখমণ্ডল প্রশান্ত, কিন্তু তাহাতে ক্ষুদ্র নয়নদ্বয়ের জ্যোতিঃ বড় তীব্র, বড় মর্ম্মভেদী। সেই দৃষ্টিতে লোকের অন্তস্তল পর্য্যন্ত বিদ্ধ হইত। ভিষকের সমস্তটা চরিত্র যেন এই ক্ষুদ্র চক্ষু দুটীর দৃষ্টির ভিতর দিয়া পূর্ণ প্রকটিত হইতেছিল। সেই দৃষ্টি দেখিয়া যুবকের মনে ভীতিসঞ্চার হইল। বিজয় কহিল, "আপনি যথার্থ অনুমান করিয়াছেন। আমি বিশেষ বিপদাপন্ন হইয়া আজ আপনার নিকট আসিয়াছি।"

বৃ। তাহা খুব সহজেই বুঝিতে পারিতেছি বাপু—তুমি বলিয়া যাও।

যু। আমার বড় বিপদ।

বৃ। তাহা নিশ্চয়—নতুবা আজ আমার এত সৌভাগ্য কেন? মহামান্য নয়নচাঁদের মহাতেজোশালী পুত্র আজ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বেণীপ্রসাদের দ্বারে উপস্থিত কেন?

যু। মহাশয়, পূর্ব্বকথা বিস্মৃত হউন। আমার পিতা আজ মৃত্যুশয্যায় শায়িত—জীবনের আশা মাত্র নাই।

বৃ। বেশ, বেশ, শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম—তাহার কি হইয়াছে ?

বৃদ্ধের এবম্বিধ নৃশংস উত্তর শুনিয়া যুবকের চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। একি মানুষ না পিশাচ? পিশাচেও বুঝি মুমূর্ষু

ব্যক্তির অমঙ্গল কামনা করে না। বিজয় কষ্টে আপনাকে সংযত করিল। তার পর ধীরে ধীরে কহিল, "মহাশয়, আপনি চিকিৎসক —রোগী শত্রু হউক, মিত্র হউক, কদাপি আপনার উপেক্ষণীয় নহে। অনুরোধ করিতেছি—পূর্ব্বকথা বিস্মৃত হউন। আজ জগদীশ্বর আমাদের মিলনের যে অভাবনীয় সুযোগ উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা নিশ্চিত ভগবানপ্রদত্ত। আপনি শত শত্রুতায় যাহা সাধন করিতে পারেন নাই, দেখুন আজ একটি ক্ষুদ্র মহত্ত্ব প্রদর্শনেই তাহা সাধিত হইবে। শত বীরত্বে যে হৃদয় জয় করিতে পারেন নাই, একটি ক্ষুদ্র প্রণয়ের **কার্য্যে আজ** সে হৃদয় জিত হইবে। আপনি আমার পিতার জীবন রক্ষা করুন।"

বৃদ্ধ পুনরায় হাস্য করিলেন। সেই তীব্র কুটিল হাস্য! হাসিয়া মধুর স্বরে কহিলেন, "যুবক, আমি ক্ষুদ্র মানব—মানব হইয়া কি সাধ্য মানবের জীবন রক্ষা করিব? ভাল, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার পিতা কি তোমায় আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন?"

বি। তিনি এতক্ষণ অচৈতন্য, জ্ঞান নাই, সংজ্ঞারহিত—শব্দোচ্চারণের শক্তি মাত্র নাই।

বৃ। তবে তুমি স্ব ইচ্ছায় এখানে আসিয়াছ?

বি। আমি স্ব ইচ্ছায়ই আসিয়াছি।

বৃ। তবে একটা গল্প বলি শোন।

সর্ব্বনাশ! একি গল্প বলিবার সময়, না গল্প শুনিবার সময়! বিজয় শশব্যস্তে কহিল, "মহাশয়, আমার আর অপেক্ষা করিবার সময় হইবে না। রোগীর অবস্থা বিশেষ আশঙ্কাজনক দেখিয়া আসিয়াছি—এতক্ষণ কি হইয়াছে ভগবান জানেন। যদি পূর্ব্ব

কথা সকল বিস্মৃত হইয়া থাকেন, তবে আর বিলম্ব করিবেন না—আমার অনুসরণ করুন।"

বৃ। আমার গল্প ছোট, ব্যস্ত হইও না, এখনি সমাপ্ত হইবে—এক বনে এক প্রকাণ্ড হিংস্র ব্যাঘ্র বাস করিত।

বিজয় দেখিল, বেণীপ্রসাদ গল্প আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। সে আর কি করিবে? অনন্যোপায় হইয়া শ্রবণ করিতে লাগিল। বেণীপ্রসাদ কহিলেন—

"ব্যাঘ্রের বড় দৌরাত্ম্য—মানুষ দূরে থাক্ বনের অন্যান্য পশুও তাহার যন্ত্রণায় টিকিতে পারিত না। এক দিন সকল পশু এ বিষয় লইয়া একটা সভা করিল। সভায় মন্ত্রণা করিয়া তাহারা শৃগালকে ব্যাঘ্রের নিকট প্রেরণ করিল। শৃগাল আসিয়া দেখিল, ব্যাঘ্র পরম সুখে গহ্বরে পড়িয়া নিদ্রা যাইতেছে। সে বুদ্ধিমান জানোয়ার, দূর হইতে অভিবাদন করিয়া কহিল, "মামা ঘুমাইতেছ কি?"

ব্যাঘ্র কহিল, "কে ও?"

শৃ। আমি শেয়াল।

ব্যা। তা বাপু, নিকটে আইস না—অত দূরে দাঁড়াইয়া কেন? কুশল ত?

শৃ। তোমার রাজ্যে আবার অকুশল কার? (মনে মনে কহিল, 'আজ কার্য্যসিদ্ধি হয়ত সকলেরই কুশল, নতুবা সমস্ত বনের অকুশল) তা মামা, তুমি রাজা, আমরা ছোট খাটো লোক, তোমার প্রজা বৈ ত নই। তোমার সাম্‌নে গেলে, তোমার মর্য্যাদা থাক্‌বে কেন? আমি এইখানেই থাকি।

ব্যা। ভাল, ভাল, কেন আসিয়াছ?

শৃ। সংবাদ শুনিয়াছ? এ বনে আর একটা জন্তু আসিয়াছে।

ব্যা। জন্তু? মূষিক না খরগোস?

শৃ। না, না, খুব বড় জন্তু। নাম বলিতে পারিতেছি না। অনেকটা তোমারই মত বটে। বলিতেছে, তোমাকে মারিয়া সে এ বনের রাজা হইবে।

ব্যা। বটে? সেটাকে একবার দেখাইয়া দিতে পার?

শৃগাল তাই চায়। কহিল, "তা পারি না? আমি সেই জন্যই ত আসিয়াছি। তুমি আমার সঙ্গে আইস না।"

তখন ব্যাঘ্র লাঙ্গুল ঘুরাইয়া, চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া, গহ্বর হইতে বাহির হইল।

শৃগাল কহিল, "মামা, তুমি বড়, আমি ছোট ; তুমি আগে যাও, আমি পেছনে পেছনে যাইব।"

ব্যা। তাহা হইলে পথ দেখাইবে কে ?

শৃ। পথ দেখাইতে হইবে না। ঐ একটা কূপ দেখিতেছ না ?

ব্যা। দেখিতেছি।

শৃ। সেইটাতে সে তোমার অপেক্ষা করিতেছে।

তখন ব্যাঘ্র গভীর গর্জ্জনে যাইয়া কূপের সমীপবর্ত্তী হইল। সেই গর্জ্জনে কূপ হইতে প্রতিধ্বনি উঠিল। ব্যাঘ্র মনে করিল এ তাহারই প্রতিদ্বন্দীর হুঙ্কার ধ্বনি। তখন সে উকি মারিয়া ভিতরে দৃষ্টি করিল। কূপের জলে ব্যাঘ্রের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছিল, সে মনে করিল তাহার প্রতিদ্বন্দী সেইখানে দাঁড়াইয়া আছে। অমনি সে লাফাইয়া পড়িল।

ব্যাঘ্র ফিরিয়া পাশ ফিরিতে পারে না। তখন শৃগালকে ডাকিতে লাগিল,— "ভাগ্নে, ভাগ্নে,—"

শৃগাল দূর হইতে বিদ্রূপ করিয়া কহিল, "কি মামা, কেমন যুদ্ধ হচ্চে ?"

ব্যা। যুদ্ধ হবে কি ছাই, আমার গা আটকাইয়া গিয়াছে—একবার এস না।

শৃ। আমি যে ছোটখাটো লোক, কেমন কোরে আস্‌ব ? তা খুব জোর করে গা'টা ফিরাইয়া লও না।

ব্যাঘ্র তাই করিতে গেল। তখন কূপের গায় ঘর্ষণ লাগিয়া তাহার শরীরে বিষম আঘাত লাগিল। ব্যাঘ্র চিৎকার করিয়া উঠিল "উ হুঁ হুঁ—"

শৃগাল মজা দেখিতেছিল। এই বেলা দৌড়িয়া পলাইল। ব্যাঘ্র তার পর ডাকিয়া খুঁজিয়া আর তার সংবাদ পাইল না। তখন ব্যাঘ্র একটু একটু করিয়া কথাটা বুঝিল।"

এই পর্য্যন্ত গল্প বলিয়া বেণীপ্রসাদ একটু হাসিল এবং জিজ্ঞাসা করিল, "কি বাপু, শুনিতেছ ত ? কেমন লাগিতেছে ?"

বেণীপ্রসাদের উত্তম গল্প বলিবার ক্ষমতা ছিল। গল্প বেশ লাগিতেছিল। কিন্তু যুবকের মানসিক অবস্থা শুনিবার মত নহে। বিজয় কহিল, "বেশ লাগিতেছে—আপনি শীঘ্র শেষ করুন।"

বে। ভাল জিনিস শীঘ্র ফুরাইতে নাই। তা ব্যস্ত হইও না, কথাটা শেষ হইয়া আসিয়াছে।

বেণীপ্রসাদ আবার আরম্ভ করিলেন ;—

এর পর ব্যাঘ্র কয়েক দিন সেই কূপের মধ্যেই রহিয়া গেল। ক্ষুধায় তার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল, তার উপর দেহের যন্ত্রণা। বাঘ দন্ত কড়মড় করিয়া ক্রোধ দমন করিয়া রাখিল। এইরূপ অবস্থায় একদিন সে মানুষের গন্ধ পাইল। সে উচ্চস্বরে ডাকিল "কে ও ওখানে?"

একজন বাহির হইতে উত্তর দিল "মানুষ। তুমি কে?"

ব্যা। আমি শেয়াল, একটা কথা শুন না।

পথিক তখন কূপের নিকট যাইয়া উঁকি মারিল। দেখিল, শেয়াল নহে—একটা বাঘ। বলিল, "ও বাবা, তুমি যে বাঘ!"

ব্যাঘ্র তখন করুণস্বরে কহিল, "তা শেয়াল হই বাঘ হই, অত ভয় পাইতেছ কেন? আমি এখন ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিয়াছি—আহার নিদ্রা একরূপ পরিত্যাগ করিয়াছি। দেখিতেছ না, পেট পড়িয়া রহিয়াছে—শরীর শুকাইয়া যাইতেছে। এগুলি কি প্রাণিভোজনের লক্ষণ বলিয়া মনে হইতেছে?"

প। তা তুমি ব্রহ্মচারী হও, সন্ন্যাসী হও, আমাকে ডাকিয়াছ কেন?

ব্যা। আমাকে তোল।

প। সেইটী করিতে সাহস হইতেছে না। তুমি অন্য কেহ হইলে আমি তোমাকে তুলিতে পারিতাম। কিন্তু তুমি ব্যাঘ্র—ব্যাঘ্রকে বিশ্বাস করিতে নাই। তুমি এখনি আমার ঘাড় মট্‌কাইয়া ভাঙ্গিতে চাহিবে।

ব্যাঘ্র দন্তে জিহ্বা কাটিয়া কহিল, "ছি, ছি, ওকথা আর মুখেও আনিও না। আর কি আমি সে পথে পদার্পণ করিতে পারি? আমার উপযুক্ত শিক্ষা হইয়াছে। অসৎপথে কদাপি চলিতে নাই, তাহা এখন বেশ বুঝিতে পারিতেছি। আজ তুমি দয়া করিয়া আমাকে রক্ষা কর, আমি নিশ্চয় কহিতেছি, এখন হইতে চিরকাল ভাল মানুষটী হইয়া চলিব।"

তখন সরল পথিক ব্যাঘ্রের কথায় প্রত্যয় করিয়া তাহাকে টানিয়া উপরে তুলিতে গেল। কিন্তু ব্যাঘ্র মৃত্তিকায় পদার্পণ করিয়াই পথিকের ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িল। মূর্খ পথিক তৎক্ষণাৎ সেইখানে প্রাণ ত্যাগ করিল।

বৃ। এখন আমার গল্প সমাপ্ত হইয়াছে। শুনিয়া কি বুঝিতে পারিতেছ?

যু। বুঝিলাম, হিংস্র জন্তুকে কখনও বিশ্বাস করিতে নাই।

বৃ। আর কিছু বুঝিলে না?

যু। আর বুঝিলাম, বিপদে পড়িলে তাহারা নানা প্রলোভনে দুর্ব্বলকে প্রতারিত করিয়া কার্য্যসিদ্ধান্তে তাহাদের সর্ব্বনাশ করে।

বৃ। তুমি চমৎকার বুদ্ধিমান দেখিতেছি। তবে আর আজ আমায় কিছু অনুরোধ করিতে আসিও না। রাত্রি হইয়াছে—ঘরে ফের।

যু। মহাশয়, এ কেমন আদেশ করিতেছেন? মনুষ্যের পক্ষে একথা খাটিবে কেন? এ ত হিংস্র জন্তুর কথা।

বৃ। এ শাস্ত্রের কথা। যাহা পণ্ডিতে কহিয়াছে, তাহা সর্ব্বত্র খাটিবে। যুবক, আমার অধ্যয়নের ব্যাঘাত হইতেছে।

এই কথা কহিয়া বৃদ্ধ আবার পুথি খুলিয়া তাহাতে মনঃসংযোগ করিলেন। বিজয় দেখিল, বৃদ্ধ তাহাকে প্রতারণা করিতেছে—তাহার এত অনুনয় বিনয় সকলই ব্যর্থ হইল। তখন সে ক্ষিপ্তের মত উঠিয়া দাঁড়াইল। দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত করিয়া কহিল, "তুমি পিশাচ! পিশাচ! পশু অপেক্ষাও অধম। চিকিৎসাই যদি তোমার ব্যবসায়, তবে শত্রু হউক, মিত্র হউক, রোগী হইলে তোমাকে পরিচর্য্যা করিতেই হইবে। নতুবা জগদীশ্বরের সমীপে এজন্য তোমায় উত্তর দিতে হইবে,—মনে রাখিও।"

বৃদ্ধেরও চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত করিয়া তিনি কহিলেন, "উদ্ধত যুবক, সে কথা আমি নিজে বুঝিব—তজ্জন্য তোমার সদুপদেশের আবশ্যকতা নাই। বাঁচন-মরণ জগদীশ্বরের হাত। তোমার পিতার জীবন রক্ষা পাওয়াই যদি জগদীশ্বরের অভিপ্রেত, তবে নিশ্চয় জানিও, আমি ছাড়াও সে জন্য উপলক্ষের অভাব হইবে না। এখন আমার সম্মুখ হইতে দূর হও।"

বৃদ্ধের শেষ কথা কয়টী তাহার অন্তর হইতে যথার্থ বাহির হইয়াছিল কি না তাহা আমরা অবগত নহি, কিন্তু সেই কথাগুলি

গৌড়েশ্বরের নৌকাপথে পলায়ন ।

সেই মুহূর্ত্তে বিধাতার কর্ণে প্রবেশ লাভ করিল। সে কথা পাঠক পরে দেখিতে পাইবেন। যুবক রাগে, দুঃখে, অভিমানে কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—*—

দেব-মন্দিরে।

Tell me, if she were not design'd
Th' eclipse and glory of her kind ?

Sir H. Wotton.

বিজয় যখন বাহিরে আসিল, তখন তাহার অবস্থা বড় শোচনীয়। বিজয় বড় আশা করিয়াই আসিয়াছিল—পিতার জীবন রক্ষা করিবে। সে আশায় তাহার ছাই পড়িল। পিতার জীবন সে আর কিরূপে রক্ষা করিবে? পিতাকে রক্ষা করিবার জন্য সে মান, অপমান কিছুই ত লক্ষ্য করে নাই। যাহাকে সম্পদের দিনে অতি তুচ্ছ মনে করিত, অতি অবজ্ঞার চক্ষে দর্শন করিত, তাহাকেই আজ কাপুরুষের মত উপযাচক হইয়া কত অনুনয় বিনয় করিল, সাধ্য-সাধনা করিল। কিন্তু তবুও ত ফল হইল না! মান গেল, সম্ভ্রম গেল, আত্মাভিমান গেল, জনকের গৌরব পর্য্যন্ত খর্ব্ব হইল—রহিল কি? ভাবিতে ভাবিতে বিজয়চাঁদ উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিল।

বেণীপ্রসাদের অট্টালিকার বাহিরে কিয়দ্দূরে একটী জলাশয়।

সেই জলাশয়-তীরে একটী ক্ষুদ্র দেবমন্দিরে নিত্য শিবপূজা হইত। বিজয় দ্রুতপদক্ষেপে সেই দিকে গেল। মন্দিরের পশ্চাতেই ঘোর আম্রবন। বৃক্ষের শাখা-প্রশাখায় পিছনদিক্‌টা একেবারেই অন্ধকারময় করিয়া রাখিয়াছে। বৃক্ষলতার শ্যামল পত্ররাশি শুভ্র মন্দির-চূড়া স্পর্শ করিয়াছিল—তাহাতে এখন চন্দ্রকর পতিত হওয়াতে বড়ই মধুর দেখাইতেছে। নিকটে সরসীবক্ষেও চন্দ্রকর-সম্পাত হইয়াছে; তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গরেখাগুলি জ্বলি-তেছে, আর মৃদুমারুতসঞ্চালনে সুধাময়ের অর্দ্ধপ্রতিবিম্বখানি সহস্রখণ্ডে চূর্ণীকৃত হইয়া সলিলতলে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

বিজয় এই মাত্র মানুষের নিষ্ঠুরতা প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছিল; এখন স্বভাবের এই রমণীয়সমাবেশ-দর্শনে মুগ্ধ হইয়া কিয়ৎকাল মন্দির-দ্বার-সম্মুখে দাঁড়াইল। সেই সময় মন্দিরের স্তিমিতালোকে অর্দ্ধোন্মুক্তদ্বার-পথে মন্দিরস্থ শিব-লিঙ্গ দৃষ্ট হইতেছিল। সেই শিব-লিঙ্গের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া, বিজয়ের মুখ কিঞ্চিৎ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

এমন অনেক সময় ঘটিয়া থাকে, যখন মানুষ আপনাকে বড় বিপদাপন্ন বোধ করে, বড় নিরাশ্রয় মনে করে, তখন কোন দেব-মূরতির সাক্ষাৎ পাইলে, কোন এক আধ্যাত্মিক শক্তির আকর্ষণে অক-স্মাৎ তাহার রুদ্ধ দ্বার তৎসমীপে খুলিয়া যায়—হৃদয়ের সমস্ত বেদনা দেব-চরণে নিবেদন করিয়া সে শান্তি লাভ করিতে চাহে। বিজয়ের আজ সেই অবস্থা হইল। তাহার হৃদয়ে যে ঘনকৃষ্ণ মেঘমালা পুঞ্জীকৃত হইয়া উঠিতেছিল, এই শিব-লিঙ্গ-দর্শনে তাহার নয়ন-যুগলের ভিতর দিয়া তাহাদের বর্ষণ আরম্ভ হইল। বিজয় মন্দিরা-রোহণ করিয়া বারান্দায় করযোড়ে দাঁড়াইল। বর্ষণে অনেকটা

মেঘ কাটিয়া গেল। হৃদয় কথঞ্চিৎ সুস্থির হইল। তখন সে কায়-মনোবাক্যে দেবতার চরণে একটা প্রার্থনা জানাইল। দৃঢ়স্বরে দেবতাকে সম্বোধন করিয়া বিজয় কহিল, "হে দেবাদিদেব, তুমি যদি শুধু প্রস্তর-মূর্ত্তি না হইয়া থাক, তবে আমার একটী প্রার্থনা শ্রবণ কর। তুমি অন্তর্য্যামী, দিব্যচক্ষে আমার অবস্থা দেখিতেছ, সন্দেহ নাই; দিব্যজ্ঞানে বুঝিতেছ, আমি আজ বড় লাঞ্ছিত, বড় অবমানিত হইয়াছি। আমি পিতার অনভিমতে আসিয়াছিলাম, আমা হইতে আজ তাঁহার মাথা হেট হইল, আমা হইতে আজ তাঁহার মান-সম্ভ্রম সব গেল—অথচ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। হে দেবাদিদেব, আজ আমি সকল আশা ভরসা তোমার চরণে অর্পিত করিলাম। তুমি দেবতা, সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ, তুমি ইচ্ছা করিলে কিনা করিতে পার? তুমিই আমার প্রার্থনা সিদ্ধ কর, তুমিই আমার পিতার জীবন-দান দেও। তোমার ইচ্ছা হইলে, কি সাধ্য নরকের কীট মনুষ্য তাহার ব্যতিক্রম করিতে পারে? তুমি আজ জগৎ-সম্মুখে দেখাও, মানুষের প্রতারণায় ঈশ্বরের রাজ্যে কাহারও ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না—কাহারও কার্য্য আবদ্ধ থাকে না।"

বলিতে বলিতে বিজয়ের হৃদয় উত্তেজিত হইয়া উঠিল, চক্ষু আরও বিস্ফারিত হইল। দন্তে অধর দংশন করিয়া অপেক্ষাকৃত আরও দৃঢ়স্বরে সে আবার কহিল, "আর সর্ব্বশেষ এই কামনা সফল কর দেব, যেন, যত দিন না এই অপমানের সমুচিত প্রতিফল দিতে পারি, যত দিন না পাপিষ্ঠের এই নৃশংসতা ও অহঙ্কার চূর্ণীকৃত হয়, ততদিন, ততদিন যেন হে দেবাদিদেব,—"

বিজয় কি একটা ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহার কথা সমাপ্ত হইল না। এই সময় পশ্চাৎ হইতে কে এক-

জন তাহাকে অতি কোমল হস্তে স্পর্শ করিয়া কহিল, "যুবক, অভিসম্পাৎ করিতেছ? ছি! অভিসম্পাৎ করিও না।"

শিকার-দর্শনে সিংহ যখন গর্জ্জন করিয়া উঠে, তখন কেহ তাহার লাঙ্গুল মর্দ্দন করিলে, পশুরাজ যেমন বাধা প্রাপ্ত হইয়া আরও অধিকতর ক্রুদ্ধ হয়, বিজয়ও তেমনি বাধা প্রাপ্ত হইয়া আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সে ফিরিয়া আগন্তককে কি একটা কড়া-রকম কথা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহার মুখের কথা মুখেই রহিল। ফিরিয়া যাহা দেখিতে পাইল, তাহা অতি আশ্চর্য্য! অতি মধুর! দেখিল, সেই মৃদুচন্দ্রালোকে আলো ও আঁধারের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া অপরূপ রূপলাবণ্যবতী রমণী-মূর্ত্তি! সেই গভীর নিশীথে স্বচ্ছতোয়জলাশয়তীরে, দেবমন্দিরের নির্জ্জন বারান্দায়, হঠাৎ এক আশ্চর্য্যরূপপ্রভাসমন্বিতা রমণী-মূর্ত্তি দেখিয়া যুবক নীরব রহিল। তাহার ক্রোধবহ্নি প্রবলমেঘবর্ষণে ক্ষুদ্র প্রদীপ-শিখা-বৎ অকস্মাৎ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। একি মূর্ত্তি? অকস্মাৎ এ মূর্ত্তি কোথা হইতে আসিল? একি দেবী, না মানুষী? মানুষে কি এত রূপ হয়? দেবতা কি এমন করিয়া মানুষের সঙ্গে কথা কহিতে আসে? তবে কে এ বিদ্যুৎবরণা ললনা? বিজয় কায়-মনোবাক্যে এতক্ষণ দেবতার সমীপে প্রার্থনা করিতে ছিল—সেই দেবতাই কি সন্তুষ্ট হইয়া বরপ্রদানার্থ তাহার নিকট এই দেববালা প্রেরণ করিয়াছেন? বিজয় নির্ণিমেষ নয়নে কেবলি চাহিয়া রহিল—চাহিয়া চাহিয়া, রমণীর সেই অপরূপ রূপ-সুধা তৃষিত চাতকের মত পান করিতে লাগিল।

রমণীর বয়স পঞ্চদশের উপর নহে, ত্রয়োদশের নীচে নহে। যৌবনের পূর্ণ লাবণ্য এখনও আসিয়া দেহে সম্পূর্ণ দেখা দেয় নাই।

দেবালয়ে বিজয়চাঁদ ও পদ্মাবতী

Emerald Printing Works, Calcutta.

এই মাত্র জোয়ার আসিতেছে—ক্ষীণ তনুর উপর দিয়া লাবণ্যের একটা ক্ষুদ্র তরঙ্গ মৃদুবেগসহকারে একটু একটু ঢেউ খেলিতেছে। তাহাতে চম্পকবরণা দেহলতিকায় যে শোভা বিস্তার হইয়াছে, তাহা সহস্র সহস্র সুন্দরী যুবতীর অঙ্গে পূর্ণবয়সেও লক্ষিত হয় না। মুখমণ্ডল বড় গম্ভীর; বালিকা বয়সে তেমন চঞ্চলতাহীন প্রতিভা-মণ্ডিত মুখমণ্ডল কদাচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে। স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে এখন আবার একটা বিষাদের রেখা মিলিত হইয়া সে মুখ আরও গম্ভীর করিয়া তুলিয়াছে। ঘন, মুক্ত, কৃষ্ণকেশপাশ চারিদিক হইতে আসিয়া সেই বিষাদ-ক্লিষ্ট মুখখানি ঢাকিয়া রাখিয়াছে—যেন নলিনীকে সহস্র ফণিনী ফণা-বেষ্টনে আবদ্ধ করিয়াছে। তাহাতে বড় বড় আয়ত চক্ষু; তদুপরি মন্মথের শরাসনতুল্য সুবঙ্কিম কৃষ্ণ ভ্রূযুগল। স্থির, গম্ভীর চক্ষুদুটী অচঞ্চল দৃষ্টিতে বিজয়ের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। যুবক নীরবে এই আশ্চর্য্য মূর্ত্তি দেখিতে লাগিল।

বিজয়চাঁদকে তদবস্থায় নীরব থাকিতে দেখিয়া মৃদুহাস্য-সহকারে মধুরকণ্ঠে রমণী আবার কহিল, "যুবক, শপথ করিও না। শপথের তুল্য পাপ নাই। কেন এ পাপ ক্রয় করিবে?"

তখন যুবক উত্তর করিল, "সুন্দরি, জানিনা তুমি কে? যদি দেবতা হইয়া থাক, তবে আমার হৃদয় অবশ্য পাঠ করিতে পারিতেছ; আর যদি মানুষী হও তবে শোন, আমি হৃদয়ে গুরুতর আঘাত পাইয়াই এ দারুণ শপথ গ্রহণ করিতেছি। আমার হৃদয় পাপিষ্ঠের নিষ্ঠুরতায় আজ প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছে।"

রমণী। যুবক, আমি দেবতা নই, দেবতার দাসীর দাসী ক্ষুদ্র মানবী মাত্র। কিন্তু আমি তোমার অবস্থা কতক কতক জানিতে পারিয়াছি। পিতার সহিত তোমার কি কথা হইতেছিল?

পিতা? কে পিতা? যুবক চমকিয়া উঠিলেন। তিনি কি বেণীপ্রসাদের দুহিতার সহিত কথা কহিতেছেন? এই স্বর্গীয় শোভাসমন্বিতা অর্দ্ধপ্রস্ফুটিতা কোমলা নলিনী কি নরকের নরক, পিশাচের পিশাচ বেণীপ্রসাদরূপকুণ্ডে প্রস্ফুটিত হইয়াছে? যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে? বেণীপ্রসাদের কন্যা?"

র। তুমি যথার্থ অনুমান করিয়াছ। আমার নাম পদ্মাবতী।

বি। তবে আর কেন, তুমি দেবতা হইলেও তোমার সঙ্গে আমার বাক্যালাপ করা উচিত হইতেছে না। তোমার পিতা আমার পরম শত্রু।

এই বলিয়া বিজয়চাঁদ গমনোদ্যত হইলেন। তখন বাধা দিয়া পদ্মাবতী কহিল, "যাইও না, ক্ষণেক অপেক্ষা কর। পিতা শত্রুতা করিয়া থাকেন, আমি তাহার শোধ দিব। তোমার পিতা কি বড় পীড়িত?"

বিজয় দেখিলেন, পদ্মাবতী তাঁহার বিষয় অবগত বটে। কহিলেন, "তুমি আমার বিষয় জান দেখিতেছি। আমার জনক মৃত্যুমুখে পতিত!—নতুবা তোমার পিতার সাহায্য-গ্রহণের কল্পনাও আমায় করিতে হইত না, আর বেণীপ্রসাদও আজ আমাকে স্বগৃহে পাইয়া অবমাননা করিবার এই উত্তম সুযোগ পাইত না।

প। আমি দ্বারের পাশে লুকাইয়া তোমাদের সকল বাক্যালাপই শ্রবণ করিয়াছি। তুমি গৃহাগত, তা'তে আবার পীড়িতের জন্য চিকিৎসক খুঁজিতে আসিয়াছিলে, এ অবস্থায় তোমাকে অবজ্ঞা করা, তাঁহার উচিত হয় নাই। কিন্তু শোন, আমি তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিব। আমি পিতার নিকট কিছু কিছু চিকিৎসা-বিদ্যা

অধ্যয়ন করিয়াছি, আমি তাঁহাকে চিকিৎসা করিব। তুমি পথ দেখাইয়া চল।

বিজয় পদ্মাবতীর কথা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন। তিনি এইমাত্র দেবতার নিকট অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে পিতার জীবন ভিক্ষা চাহিতেছিলেন; একি তবে সেই দেবতারই ছলনা? বিজয় কহিলেন "কিন্তু তুমি বেণীপ্রসাদের কন্যা। বেণীপ্রসাদ কি বলিবে?"

প। তাঁহার এ কথা জানিবার আবশ্যকতা কি? আমি যখন-তখন এ মন্দিরে আসিতে পারি। গভীর নিশিতেও এইখানে বসিয়া আমি ও শ্যামলী কত গল্প করিয়া সময় কাটাইয়া দেই। পিতা কখনও আমাদের এ স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন না। আমি যে মন্দির হইতে অন্যত্র যাইতেছি, তাহা তাঁহার জানিবার কোনই সম্ভাবনা নাই; তুমি সে আশঙ্কা কিছুমাত্র করিও না।

বি। ভাল, তোমার পিতা খবর নাই রাখুন, আমি কি প্রকারে তোমায় লইয়া যাইব?

প। শ্যামলী আমার সখী, সে সঙ্গে যাইবে।

বি। আমি কেবল সে কথাই বলিতেছি না। তোমার পিতা যাহাকে বিনা অপরাধে তাড়াইয়া দিয়াছে, সে কি প্রকারে তাহার কন্যার সাহায্য গ্রহণ করিবে?

প। সে কথাটা কি কিছুতেই বিস্মৃত হইতে পারিতেছ না? পিতাকে মার্জ্জনা কর।

বিজয় আবার উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "মার্জ্জনা! জান পদ্মাবতি, তোমার পিতা আজ আমাকে কুক্কুরের মত বাটী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন?"

প। সে জন্যইত ভাই মার্জ্জনা করিতে বলিতেছি। অপরাধ না

করিলে, কে কবে কাহাকে মার্জ্জনা করিতে পারিয়াছে? পিতা যদি নির্দ্দোষীই হইবেন, তবে তোমাকে আজ আমি ক্ষমার জন্য অনুরোধ করিব কেন? তোমারই বা ক্ষমা করিবার কি অধিকার থাকিবে?

বি। কিন্তু আমার হৃদয় প্রতিহিংসাময়। ক্ষমা করিবার শক্তি মাত্র নাই।

প। চেষ্টা করিলেই শক্তি পাইবে। প্রতিহিংসায় মহাপাপ! মার্জ্জনায় মহাপুণ্য! তুমি আজ এ পুণ্যসঞ্চয়ের যে উত্তম সুযোগ পাইয়াছ, তাহা অবজ্ঞা করিও না। দেবতা সন্তুষ্ট হইবেন।

বিজয় দেখিলেন পদ্মাবতী কেবল রূপবতী নহে, জ্ঞানবতীও বটে। তাহার এ যুক্তির উপর অন্য যুক্তি খাটে না। বিশেষ, সুন্দরী রমণীর অনুরোধ যুক্তিতর্কের বাধাবাধ না থাকিলেও অনেক সময় বাধ্য হইয়া মানিতে হয়। পদ্মাবতীর রূপ অনন্ত, যুক্তি অনন্ত, রূপের মোহিনী-শক্তিও বুঝি অনন্ত, বিজয়চাঁদ বশীভূত হইলেন। কিন্তু কহিলেন, "তুমি বালিকা, সুবর্ণগ্রামের সকল চিকিৎসক যে রোগ নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, তুমি বালিকা হইয়া তাহার চিকিৎসা করিতে পারিবে?"

প। ভাই, আরোগ্য অনারোগ্য ভগবানের হাত। পিতা আমাকে যথাশক্তি শাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছেন, এখন রোগীর অদৃষ্ট ও আমার হাত-যশ। তাঁহার কি পীড়া হইয়াছে?

বি। পীড়া কি, সে কথা আমি তোমাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিব না, সে পীড়া কেহই নির্ণয় করিতে সমর্থ নহে। শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা, দিনে দিনে, মাসে মাসে তিল তিল করিয়া কেবল দেহ ক্ষয়িত হইতেছে।

পদ্মাবতী কতক্ষণ কি ভাবিল। তারপর কহিল, "বেশ, পথ দেখাইয়া চল। না দেখিলে বুঝিতে পারিব না। শ্যামলি, এই দিকে আয়।"

শ্যামলী পদ্মাবতীর পরিচারিকা, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সে এতক্ষণ বাহিরে একটা গাছের নীচে দাঁড়াইয়াছিল। এখন নিকটে আসিল। পদ্মাবতী কহিল, "ঔষধের পুটুলী আনিয়াছিস্?"

শ্যা। আনিয়াছি।

শ্যামলী নামের মহিমা রক্ষা করিয়াছিল। তাহার বর্ণ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। বয়স অনুমান পঁচিশ কি ত্রিশ বৎসর। চেহারাখানা মন্দ নয়—সদাই হাসিপ্রফুল্ল। দেখিলেই মনে হইত, বেশ বুদ্ধিমতী ও সুরসিকা। সে আসিয়া একটা কথাও কাহাকে জিজ্ঞাসা করিল না, কেবল এক কথায় পদ্মাবতীকে উত্তর করিল "আনিয়াছি"। কিন্তু তাহার চক্ষু দু'টী বড় হাসিতেছিল। সেই হাসি দেখিয়া বিজয়চাঁদ বুঝিতে পারিলেন শ্যামলীও সকল বিষয় অবগতা।—পদ্মাবতী ও শ্যামলী পূর্ব্বেই পরামর্শ করিয়া প্রস্তুত হইয়া আসিয়া থাকিবে।

তখন তিনজনে বাহির হইয়া নগরের দিকে হাঁটিয়া চলিল। পথে বিজয়চাঁদ ও পদ্মাবতী পরস্পরকে অনেকবার নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন। শ্যামলী গোপনে গোপনে উভয়কেই লক্ষ্য করিতে করিতে চলিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—*—

ব্যাধি-নির্ণয়।

—the life of all his blood
Is touch'd corruptibly,—

Shakespeare.

যখন বিজয়চাঁদ পদ্মাবতী-সহ গৃহে পৌঁছিলেন, তখন রাত্রি গভীরা—দ্বিপ্রহরাতীত প্রায়। চারিদিক্ নিস্তব্ধ। বৈদ্যগণ বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। কক্ষ-মধ্যে কেবল পান্না ও দু'চারিটী পরিচারিকা বসিয়া রোগীর শুশ্রূষায় ব্যস্ত রহিয়াছে। কক্ষের বাহিরে দূরে গৃহান্তরে বসিয়া পুরুষগণ কেহ নিদ্রিত, কেহ অর্দ্ধবিনিদ্রিতাবস্থায়অপেক্ষা করিতেছে। বিজয়চাঁদ কক্ষপ্রবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পান্না, এখন কিরূপ বোধ হইতেছে? যাতনা কি বড় বৃদ্ধি পাইয়াছিল?"

রোগী তখন ঘুমাইতেছিল, অথবা জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। পান্না কহিল, "এখন একটু ভাল বোধ হইতেছে। তোমার সঙ্গে ও কে আসিয়াছে?"

বি। বেণীপ্রসাদের কন্যা—পদ্মাবতী।

পান্না কিছু আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "তুমি কি রাজবৈদ্যকে লইয়া আসিয়াছ? তুমি না সেখানে গিয়াছিলে?"

বি। গিয়াছিলাম ত ঝকমারি করিয়াছিলাম। আমাকে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। তিনি আসিলেন না।

পান্না অত কথা বুঝিল না। বলিল, "তবে ইহাকে কে লইয়া আসিল ?"

বি। উনি আমার সঙ্গে আপনি আসিয়াছেন—সঙ্গে পরিচারিকা আসিয়াছে। সরিয়া বইস, ইনিও চিকিৎসক, পিতাকে দেখিবেন। কিন্তু ওকি ?

পদ্মাবতী ততক্ষণ রোগীর নিকটে আসিয়া তাহার মুখের দিকে দৃষ্টি করিতেছিল। হাঠাৎ সে চমকিয়া উঠিল। বিজয় কথা বলিতে বলিতে উহা লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওকি—ওরূপ করিয়া উঠিলে যে ?"

পদ্মা উত্তর করিল না। আরও ভালরূপে রোগীর অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে লাগিল। হস্ত, নখ, চক্ষু, নাসিকা, ওষ্ঠ, জিহ্বা সকল দেখিল ; তারপর বড় গম্ভীর হইয়া বসিল। বিজয়-চাঁদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরূপ দেখিলে, আরোগ্যের সম্ভাবনা দেখিতেছ কি ?"

পদ্মাবতী কিছু উত্তর করিল না। পুনরায় রোগীর দেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিল। তারপর আবার গম্ভীরভাবে বসিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "এ রোগ কতদিন যাবৎ জন্মিয়াছে ?"

বি। প্রায় ছয় মাস কাল।

পদ্মাবতী আবার রোগীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "তুমি বলিতেছিলে, শরীরে অসহ্য যাতনা। সে যাতনা কিরূপ কিছু বলিতে পার কি ?"

বি। অগ্নিদাহের মত। সমস্ত শরীর ভিতর হইতে জ্বলিতে থাকে, এমত অনুভূত হয়।

প। এ জ্বালা কি দিন দিনই বাড়িতেছে ?

বি। দিন দিনই বাড়িতেছে।

প। এ ঘরে কে থাকে ?

বি। আর কে থাকিবে ? আমরা দুই ভাই বোন ও দু'চার জন পরিচারিকা।

প। পুরুষ আর কেহ আইসে না ?

বি। বিশেষ প্রয়োজন না হইলে বড় কেহ আইসে না। ভৃত্যেরা সময় সময় আইসে, কিন্তু প্রায়ই বাহির হইতে অনুমতি গ্রহণ করে।

প বৈদ্য ?

বি। বৈদ্যের আসিবার বাধা নাই। কিন্তু ও সব কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন ?

পদ্মাবতী আবার অন্যমনস্ক হইল। তাহার লক্ষণ দেখিয়া বিজয় বুঝিতে পারিলেন, অবশ্য ভিতরে একটা কথা আছে। তিনি পদ্মার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। পদ্মা আবার রোগীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া পান্নাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, "ভগিনি, তুমি একটু কক্ষান্তরে যাও, আমার একটা বিশেষ কথা আছে।"

বিজয় ও পান্না উভয়েই বড় আশ্চর্য্যান্বিত ও ভীত হইল। পান্না কক্ষান্তরে উঠিয়া গেল। তখন বিজয় কহিলেন, "তুমি কি এখনই অমঙ্গল আশঙ্কা করিতেছ নাকি ?"

প। ব্যস্ত হইও না। সে আশঙ্কা সম্প্রতি নাই। কিন্তু আমি এ কি দেখিতেছি ?

বি। কি দেখিতেছ পদ্মা ?

প। কেহ তোমার পিতাকে বিষপ্রয়োগ করিয়াছে।

বি। বিষ !

প। নিশ্চিত বিষ। আমি ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি।

কক্ষমধ্যে বজ্রপতন হইলে বিজয়চাঁদ অধিকতর বিস্মিত হইতেন না। তিনি কহিলেন, "এ অসম্ভব! এমন শত্রু আমাদের কে?"

প। বিজয়, জগতে শত্রুর অভাব নাই। কত মহৎ মহৎ ব্যক্তির শত্রু রহিয়াছে, আর তুমি আমি কে?

এমন সময় হঠাৎ কক্ষের পশ্চাদ্দিক্‌স্থ জানালায় একটা শব্দ হইল। বিজয় ও পদ্মাবতী উভয়েই সেই দিকে চাহিলেন। বিজয় চাহিয়াই লম্ফ প্রদান করিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার যেন বোধ হইল, কাহারও একটা শ্মশ্রুমণ্ডিত বদনমণ্ডল হঠাৎ জানালা হইতে সরিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। বিজয় জানালার নিকটে আসিয়া অনেক ক্ষণ এদিক ওদিক লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু আর কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। সে কালে দেশে বড় পাঠানের উৎপাত হইয়াছিল। বিজয়ের বোধ হইল, জানালা-পথে তিনি একটি তাতার-মূর্ত্তি দর্শন করিলেন। তিনি অন্যমনস্ক হইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

পদ্মাবতী জিজ্ঞাসা করিল—"কেহ পলাইল কি?"

বি। সেইরূপ অনুমান হইতেছে।

প। তুমি সাবধান হইও। তোমার গৃহে শত্রু প্রবেশ করিয়াছে। এই ঔষধ গ্রহণ কর, প্রতিদিন সকালে বৈকালে এক এক পুরিয়া খাইতে দিবে।

বি। পীড়া আরোগ্য হইবে, বলিতে পার?

প। এখন হইতে রীতিমত সাবধান হইলে এ ঔষধে হইতে পারে। কিন্তু সাবধান, এ রোগ একদিনে শরীরে

প্রবিষ্ট হয় নাই। এ বিষ সাধারণ বিষ নহে। দিনে দিনে, সপ্তাহে সপ্তাহে এ বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছে—হয়ত, এখনও হইতেছে। তাহাতে একটু একটু করিয়া শরীর ক্ষয়িত হইতেছে। এত ধীরে ধীরে ইহার কার্য্য হইতেছে যে, অতি বিচক্ষণ লোকেরও ইহা ধরিবার উপায় নাই। পিতা অতি যত্নে এ সকল বিষয় আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন, তাই ইহা আমার চক্ষু এড়াইতে পারে নাই। নতুবা এ ভয়ঙ্কর বিষের ক্রিয়া সাধারণতঃ চিকিৎসকের জ্ঞাতব্য নহে। বিজয়, তোমাকে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। ভুলেও যেন রোগীর পার্শ্ব অধিক ক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া থাকিও না। আমি কাল আসিয়া আবার দেখিয়া যাইব। আজ রাত্রি অনেক হইয়াছে, বিদায় হই।

পদ্মাবতী, পান্না ও বিজয়ের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া শ্যামলীসহ শ্রেষ্ঠীর গৃহ ত্যাগ করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—*—

অদ্ভুত দর্শন।

প্রাণী একজন আসি উপনীত
শিরেতে কিরণ-ছটা,—
হেমচন্দ্র।

যতক্ষণ পদ্মাবতী রুগ্নকে পরীক্ষা করিয়া-দেখিতেছিল, ততক্ষণ শ্যামলী বাহিরে দাঁড়াইয়া গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতেছিল,

বৃক্ষ-বল্লরী হইতে নববিকসিত পত্রাদি লইয়া নখরাঘাতে একটু একটু ছেদন করিতেছিল, আর মধ্যে মধ্যে আকাশ, পাতাল, পৃথিবী, চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। পদ্মাবতী ফিরিয়া আসিলে সে জিজ্ঞাসা করিল—"ঠাকুরাণি, কিরূপ দেখিলে?"

পদ্মা সে কথার হঠাৎ কিছু উত্তর না করিয়া শ্যামলীর হস্তাকর্ষণ পূর্ব্বক রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল। তারপর মৃদুমন্দ পদবিক্ষেপ করিতে করিতে কহিল,—"শ্যামলি, এ শ্রেষ্ঠী কে—কিছু জানিস্?"

শ্যা। শুনিলাম ত নাম নয়নচাঁদ শ্রেষ্ঠী।

প। তা নয়নচাঁদ হউক, শ্যামচাঁদ হউক, তাতে আমাদের কিছু আবশ্যকতা নাই। নাম জানিয়া কি হইবে? তাঁহার বিষয়-আশয়, আত্মীয়-স্বজন, ব্যবসা-বাণিজ্য, এ সবের খবর আমাদিগকে লইতে হইবে। বড় বিষম ব্যাপার!

শ্যা। কি ঘটিয়াছে ভাঙ্গিয়া বল—আমার বড় কৌতূহল হইতেছে।

প। কেহ শ্রেষ্ঠীকে বিষপ্রয়োগ করিয়াছে।

শুনিয়া শ্যামলী চমকিয়া উঠিল। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "বিষপ্রয়োগ করিয়াছে—তুমি ঠিক বুঝিতে পারিয়াছ ত?"

তখন পদ্মা ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "শ্যামলি, পিতার কাছে কি বৃথাই এতদিন অধ্যয়ন করিলাম? আমি ঠিক বুঝিতেছি, কেহ অলক্ষ্যে থাকিয়া শ্রেষ্ঠীর জীবন নাশ করিতে চাহিতেছে।"

শ্যা। এ বড় অদ্ভুত কথা। শুনিয়াছি, নয়নচাঁদ অতি সাধু প্রকৃতির লোক; আর বিজয় চাঁদের বাহুবলে সুবর্ণগ্রাম রক্ষিত—কে এমন নৃশংস দুঃসাহসিক কাজ করিল?

শ্যামলীর বাক্য শ্রবণ করিয়া হঠাৎ পদ্মাবতীর দুই চক্ষু বড় উজ্জ্বল

হইয়া উঠিল। পদ্মা সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, “পাপকার্য্য-সাধনে লোকের অভাব হয় না। অবশ্য কোন নিগূঢ় কারণে স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া কেহ এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছে। কিন্তু শ্যামলি, ঈশ্বরের বিধান অতি অপূর্ব্ব—আমি এ যাত্রা শ্রেষ্ঠীকে এ বিপদ হইতে রক্ষা করিব—আমি নয়নচাঁদকে আরোগ্য করিব।”

শ্যা। চিকিৎসা করিলে শ্রেষ্ঠী আরোগ্য হইবে?

প। সাধারণ চিকিৎসায় নহে। আমি পিতার নিকট হইতে কতকগুলি অতি গুপ্ত চিকিৎসা-তত্ত্ব অবগত হইয়াছি। এতদিন উহাদের শক্তি পরীক্ষা করিবার সুযোগ হয় নাই—এখন তাহা ব্যবহার করিব।

শ্যা। কিন্তু তাহাতে সময়ের আবশ্যকতা হইবে; তুমি কতদিন এ ভাবে এখানে যাতায়াত করিবে?

প। যতদিন আবশ্যক হয়?

শ্যা। কিন্তু সে কতদিন? অধিক দিন হইলে চলিবে কি?

প। কেন চলিবে না?

শ্যা। যদি ধরা পড়?

প। কে ধরিবে?

শ্যা। তোমার পিতা।

প। তাতে ক্ষতি কি?

শ্যা। ক্ষতি কি? যিনি নিজে এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন না, তিনি তোমাকে তাহা করিতে দিবেন? বুঝিতে পারিতেছ না, নয়নচাঁদের সহিত তাঁহার সম্প্রীতি নাই—তিনি তাঁহার মিত্র নহেন।

এ কথা কয়টি শ্রবণ করিয়া পদ্মাবতী বড় চঞ্চল হইয়া উঠিল। প্রীতি নাই? মিত্র নহেন? হাঁ, এ কথাত পদ্মা কতবারই

শ্রবণ করিয়াছে। কিন্তু এই না শ্যামলী কহিতেছিল, "শ্রেষ্ঠী অতি সদাশয়, তাঁহার কেহ শত্রু সম্ভবে না",—তবে তাহার পিতা তাঁহার শত্রু হইলেন কেন? তার পর আরও কথা। শত্রু হইলেই কি লোকে শত্রুর নিপাত কামনা করে? যাঁহারা সদাশয়, তাঁহারা শত্রু হইতে আত্মরক্ষা করিয়াই ক্ষান্ত হন—শত্রুকে বধ করিতে চাহেন না। কৈ পিতা ত শুধু আত্মরক্ষা করিয়াই ক্ষান্ত নহেন। মুমূর্ষু শ্রেষ্ঠীকে ইচ্ছা করিলে তিনি রোগমুক্ত করিতে পারিতেন। হাঁ, নিশ্চয় পারিতেন— চিকিৎসা-বিদ্যায় তিনি অদ্বিতীয়। কিন্তু তিনি ত তাহা করিলেন না! শ্রেষ্ঠীর নিপাত-কামনা যদি তাঁহার না থাকে, তাহা হইলে চিকিৎসক হইয়া নিশ্চয়ই তিনি এ কার্য্য করিতে পারিতেন না। তবে কি—পদ্মা আর ভাবিতে পারিল না। তাহার চিত্ত প্রবলবায়ুসন্তাড়িত সাগরবক্ষতুল্য উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। উভয়ে অনেকক্ষণ নিঃশব্দে পথ অতিবাহিত করিয়া চলিল।

এইরূপ চলিতে চলিতে হঠাৎ পদ্মার অনুভব হইল, যেন পশ্চাতে কাহারও পদশব্দ হইতেছে। শ্যামলী অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া যাইতেছিল, পদ্মা পশ্চাতে ছিল। পদশব্দ অনুভূত হইবা মাত্র পদ্মাবতী ফিরিয়া চাহিল; কিন্তু অস্পষ্টালোকে কিছুই নেত্র-গোচর হইল না, বা আর কোন রূপ শব্দও শুনিতে পাইল না। তখন পদ্মা আবার শ্যামলীর অনুসরণ করিতে লাগিল। কিন্তু আবার একটু যাইতেই সেইরূপ বোধ হইতে লাগিল। পদ্মা আবার ফিরিয়া চাহিল। আবার কিছু লক্ষ্য হইল না; কিন্তু এবার বোধ হইল, যেন অদূরে পথিপার্শ্বে কাহার পদের মর্ম্মর ধ্বনি হইল। তখন পদ্মা চুপি চুপি শ্যামলীর নিকটে যাইয়া কহিল, "একটু হাঁটিয়া চল, আমার সন্দেহ হইতেছে, কেহ আমাদের অনুসরণ করিতেছে।"

কথা শুনিয়া শ্যামলী কহিল, "তুমি আজ ভয় পাইয়াছ, দেখিতেছি—রাজা বল্লাল জীবিত থাকিতে রাজধানীতে কে আমাদের অনিষ্ট করিবে ?"

পদ্মা কহিল, "অত চেঁচাইও না। যে দিন হইতে নগরে যবন প্রবেশ করিয়াছে, সে দিন হইতে সে নিঃশঙ্কভাব তিরোহিত হইয়াছে। আমার নিশ্চয় বিশ্বাস হইতেছে, কেহ কোন অসাধু উদ্দেশ্যে আমাদের অনুসরণ করিতেছে। আমি এখনও তোমাকে সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলি নাই। সব কথা শুনিলে এ কথা তুমি আরও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে। এখন দ্রুত হাঁটিয়া চল—যাইতে যাইতে সকল কহিতেছি।"

তখন পদ্মা ও শ্যামলী দ্রুতপদক্ষেপ করিতে করিতে চুপি চুপি আলাপ করিতে লাগিল। এতক্ষণ পদ্মা বাতায়নে দৃষ্ট মনুষ্যমূর্ত্তির কথা শ্যামলীর নিকট ব্যক্ত করে নাই, এখন সে কথা ভাঙ্গিয়া বলিল। শুনিয়া শ্যামলীও চিন্তিত হইল। এমত সময়ে আবার পদশব্দ শ্রুত হইল। এবার শ্যামলীও তাহা শুনিতে পাইল। তখন শ্যামলী পদ্মাকে নিকটে টানিয়া তাহার কাণের নিকটে মুখ লইয়া গিয়া কহিল, "লক্ষণ আশঙ্কাজনক বটে, লোকটা কে দেখিতে হইতেছে। আমি এক বুদ্ধি ঠিক করিয়াছি। দ্রুত ঐ মোড়ের নিকটে চল।"

তখন অতি দ্রুত চলিতে চলিতে পদ্মাতে ও শ্যামলীতে কি একটা পরামর্শ হইল। রাস্তা কিয়দ্দূরে যাইয়া একস্থানে দুইটী শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। একটা বামে, একটা দক্ষিণে চলিয়া গিয়াছে। যে রাস্তাটা বামে গিয়াছে, তাহার সম্মুখে একটা বড় বাঁক। সে বাঁক ঘুরিলে পশ্চাৎ হইতে আর কাহাকেও দেখা

যায় না। সে বাঁকের পর মোড় ঘুরিলেই বিশ কি পঁচিশ হাত পরে আর একটী দ্বিতীয় বাঁক। সুতরাং কেহ প্রথমোক্ত বাঁক ঘুরিলে কতকদূর পর্য্যন্ত সম্মুখে কি পশ্চাতে কোথাও দৃষ্টি চলে না। পদ্মা ও শ্যামলী এই বামের রাস্তা ধরিয়া প্রথম মোড়ের নিকটে আসিল। তার পর মোড় ঘুরিয়া যখন দেখিল, সম্মুখে কি পশ্চাতে কেহই তাহাদিগকে দেখিতে পাইতেছে না, তখন উভয়ে পথিপার্শ্বস্থ ঝোপের নীচে লুকাইল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সে স্থান হইতে অগ্র পশ্চাতে কোথাও অধিক দূর দৃষ্টি চলে না, সুতরাং কেহ তাহাদের এই কাণ্ড স্বচক্ষে না দেখিলে, নিকটে আসিয়াও, কেহ পথিপার্শ্বে লুক্কায়িত রহিয়াছে—এ সন্দেহ করিতে পারিত না। কারণ অগ্রগামী ব্যক্তি লুক্কায়িত না থাকিয়া অগ্রে অগ্রে যাইয়া দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়াছে, এমনও মনে হইতে পারিত। এতদ্ব্যতীত স্থানটীর আরও একটা সুবিধা ছিল। যখন এই কাণ্ড হইতেছিল, তখন রজনী আড়াই প্রহর অতীতপ্রায়। চন্দ্র অস্তগত, কিন্তু নির্ম্মলাকাশে তখনও সহস্র সহস্র নক্ষত্র উজ্জ্বল হীরকখণ্ডের মত জ্বলিতেছিল। তাহাদের আলোকে রাজপথ কিঞ্চিৎ আলোকিত। কিন্তু যে স্থানে রমণীদ্বয় লুক্কায়িত হইল, সে স্থান ঘোর অন্ধকারময়। ঝোপের নিকটে বড় বড় দুই তিনটা তেঁতুল গাছ ছিল—তাহাদের নিবিড় পত্রগুচ্ছ ভেদ করিয়া সে স্থানে নক্ষত্র-রাজির ক্ষীণালোক কিছুতেই প্রবেশ করিতে পারিতেছিল না। সুতরাং লুক্কায়িত ব্যক্তি সেই স্থানে বসিয়া বেশ নিরাপদে ও অলক্ষ্যে রাজপথবাহী যে কোন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিতে পারিত। পদ্মা ও শ্যামলী সেই অন্ধকারে ঝোপের নীচে দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহাদের উদ্দেশ্য সফল হইতে অধিক বিলম্ব হইল না। কিছু

পরেই অদূরে অস্পষ্ট পদশব্দ শ্রুত হইল। পদ্মা ও শ্যামলী রুদ্ধ-শ্বাসে বিস্ফারিত নেত্রে পথের দিকে চাহিয়া রহিল। তখন অকস্মাৎ সেই নক্ষত্রালোকিত রাজপথ দিয়া আকণ্ঠ রক্তবস্ত্র-বিভূষিত, অর্দ্ধ-চন্দ্রাঙ্কিতকিরীটী এক বলিষ্ঠ-গঠন মুসলমান ফকির দ্রুতগতিতে চলিয়া গেল!

ফকির চলিয়া গেলে উভয়ে উভয়ের দিকে কিয়ৎকাল নীরবে তাকাইয়া রহিল। কতক্ষণ পর্য্যন্ত কাহারও বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তাহারা যে দৃশ্য দেখিল, তাহা বিশেষ আশঙ্কার কারণজনকই বটে। সে সময়ে দেশে নানারূপ ভণ্ড ফকিরের আবির্ভাব হইয়াছিল। ভারতে তখন মুসলমান সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে মাত্র—সমগ্র দেশ তখনও জিত হয় নাই। হিন্দুর রাজ্যে রাজ্যে নানা বেশে তত্ত্বসংগ্রহার্থে নানা গুপ্তচর ফিরিতেছিল। তাই পদ্মা ও শ্যামলী বড় চিন্তিত হইল। সে কালে রমণীরাও দেশের কথা ভাবিত। আজকালকার অনেক স্বদেশদ্রোহী বর্ব্বর পুরুষাপেক্ষা তাহারা দেশের মর্য্যাদা অনেক বেশী বুঝিত। কিন্তু সে কথা পরে বিস্তারিত কহিতেছি। এখন পদ্মা ও শ্যামলী কিয়ৎক্ষণ সেই ভাবে সেই স্থানে বসিয়া থাকিয়া, উঠিয়া, পথ ধরিয়া আবার পিছনের দিকে চলিতে লাগিল। যেখানে তিনটি রাস্তা একত্র হইয়াছে, সেখানে আসিয়া এবার সেই দক্ষিণের রাস্তা ধরিল। সেই রাস্তাই বেণীপ্রসাদের আলয়ে যাইবার প্রকৃত পথ। অনুসরণকারীকে দিগ্‌ভ্রষ্ট করিবার জন্যই কেবল তাহারা এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল। এখন আবার এই পথে গৃহে ফিরিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—*—

ইতিহাসের একপৃষ্ঠা।

Happy the man, whose wish and care
A few paternal acres bound,
Content to breathe his native air
In his own ground.

A. Pope.

এখন পাঠককে আমার নিকট দুইটা ইতিহাসের কথা শুনিতে হইবে।

ইতিহাসের কথা বড় রুক্ষ—বিশেষ বাঙ্গালী পাঠকের কাছে। বাঙ্গালী একে ত ইতিহাস পড়িতেই ভাল বাসে না, তাহাতে যদি বা কখনও পড়ে, সে কেবল পরের কথা। নিজের কাহিনীর কাছ দিয়া ভ্রমেও পা মাড়ায় না—পাছে বা গঙ্গাস্নান করিতে হয়! ইংলণ্ডের প্রথম চার্লস্ কিরূপে নিহত হইয়াছিলেন, দ্বিতীয় জেমস্ কেন দেশ হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন, পারস্যাধিপতি জারেক্সস্ কিরূপে গ্রীস্ আক্রমণ করিয়াছিলেন, গ্রীস্‌বাসিগণই বা কিরূপে দেশ রক্ষা করিয়াছিল, জুলিয়াস্ সিজার কে, কিরূপে তাঁহার পতন হইল, কিরূপে তিনি দেশ জয় করিয়াছিলেন—এ সকল বিষয়ে বাঙ্গালী খবর রাখে, অনর্গল বক্তৃতা দিতে পারে, প্রবন্ধ লিখিতে জানে, কিন্তু স্বদেশের কথা, স্বজাতির বিবরণ তাহার মনে স্থান পায় না, লেখনি-মুখে বিকসিত হয় না। আমরা ট্রজান যুদ্ধের বিবরণ বেশ

জানি, কিন্তু রামায়ণ মহাভারতের কোথায় কি আছে, সেটার তেমন খবর রাখি না। শার্লেমন কে? কোথায় রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন? কত বড় রাজা ছিলেন? এ সব আমাদের ঘরের কথা। কিন্তু বিক্রমাদিত্য কে ছিলেন, কোন্ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কোন্ কালে প্রাণ ত্যাগ করেন, তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না! সেক্ষপীর, মিল্টন, শেলি, স্পেনসার, বায়রণ—এ সব আমাদের চিরপরিচিত, তাঁহাদের কথা মুখে ধরে না, কিন্তু কালিদাস, ভবভূতি, মাঘ, ইঁহাদের বিষয় কয়জনে খবর লন? ইঁহাদের কথা কয় জনে জানেন? লিওনিডাস্ কি প্রকারে থর্ম্মোপালিতে দাঁড়াইয়া দেশ রক্ষা করিলেন, কি প্রকারে প্রাণোৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহা বেশ করিয়া বর্ণনা করিতে পারি, কিন্তু প্রতাপসিংহের বিবরণ তাঁহার গৌরব-কাহিনী, তাঁহার স্বদেশহিতৈষিতা, এ সকল আমাদের তেমন জানিবার বিষয় নহে, জানিবার আবশ্যকতা নাই। কি করিয়া গ্রীস্ গেল, রোম ছারখার হইল, মিসরের স্বাধীনতা লুপ্ত হইল, কনষ্টাণ্টিনোপল তুরস্কের হাতে পড়িল, তাহা শতমুখে ব্যাখ্যা করিতে পারি, কিন্তু কি করিয়া এই সোণার বাঙ্গালার এই পরিণাম হইল, গৌড়, নবদ্বীপ, পলাসী জিত হইল, সে কথা স্বরূপ কাহারও জানিতে ইচ্ছা হয় না! হরি! হরি!—অতঃপর বাঙ্গালীর এতদপেক্ষা গৌরব-কাহিনী আর কি হইতে পারে! সুতরাং, দেশের উপর যখন বাঙ্গালীর এতটা রাগ, এতটা অভিমান, যখন ইংরেজী জানিলেই বাঙ্গালায় কথা কহিতে নাই, হেট্-কোট্ থাকিলেই ধুতি চাদর পরিলে জা'ত যায়, যখন বৈদেশিক তত্ত্ব শিখিলেই দেশের কাহিনী জানা একটা মস্ত অসভ্যতা, নিরেট বর্ব্বরতা, তখন এই উপাখ্যান-পাঠের খাতিরেও যে কেহ পরিশ্রম করিয়া একখানা ইতিহাস পাঠ

করিবেন—সে ইতিহাসই বা কৈ ?—সে ভরসা আমাদের নাই। তাই এই পুস্তকের বর্ণিত বিষয়গুলি বুঝাইবার জন্য যতটুকু ইতিহাসের দরকার পড়িবে, ততটুকু ইতিহাস আমি এই স্থলে লিপিবদ্ধ করিব।

গৌড় ও নবদ্বীপ মুসলমানাধিকৃত হইলে মহারাজা লক্ষ্মণসেন উড়িষ্যাভিমুখে পলায়ন করেন—একথা সকলেই অবগত আছেন। কেহ কেহ বলেন তিনি তথায়ই প্রাণত্যাগ করেন। কিন্তু সে কথা ঠিক নহে। গৌড় ও নবদ্বীপের সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র বঙ্গদেশ মুসলমানের করায়ত্ত হয় নাই, লক্ষ্মণসেনের কনিষ্ঠ সহোদর বিশ্বরূপসেন পূর্ব্ব বঙ্গের অধীশ্বর ছিলেন। তিনি তখনও প্রবল প্রতাপে তথায় রাজ্য করিতেছিলেন। কিয়ৎকাল উড়িষ্যায় অবস্থান করিয়া লক্ষ্মণসেন কনিষ্ঠের নিকট গমন করেন। মহারাজা বিশ্বরূপসেন তখন বিক্রমপুর, সুবর্ণগ্রাম ও সপ্তগ্রাম এই তিন স্থানেরই অধিপতি। কিন্তু বিক্রমপুরেই তাঁহার প্রধান রাজধানী ছিল ; তিনি অগ্রজকে সুবর্ণগ্রাম অর্পণ করিলেন।

লক্ষ্মণসেন সুবর্ণগ্রামে অধিক কাল রাজত্ব করিতে পারেন নাই। অল্পকাল পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্রপৌত্রাদি কেহ ছিল কিনা সে সংবাদ ভাল জানা যায় না। আইন আক্‌বরীতে নারায়ণ ও সুরসেন বলিয়া দুই জনের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু তাঁহাদের রাজত্বের কোন প্রমাণ নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর বিশ্বরূপসেনের পুত্র দনুজমর্দ্দন সেন সুবর্ণগ্রামের অধিপতি হইলেন। এই দনুজমর্দ্দনই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দনুজ রায়। যখন পশ্চিমবঙ্গে মুঘিসুদ্দীন তুগ্রল বিদ্রোহী হইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিল, তখন দিল্লীশ্বর বুলবন তাঁহার বিরুদ্ধে বঙ্গে আগমন করিয়া দনুজ রায়

হইতে বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু দনুজরায় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি। সম্রাটের অপরিমেয় পরাক্রম দর্শনে তিনি বুঝিতে পারিলেন, রাজ্য বিশেষ সুরক্ষিত করিতে না পারিলে, প্রবল মুসলমান শক্তির কবল হইতে আর হিন্দুস্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভবপর নহে। এই জন্য তিনি সম্রাটের প্রত্যাবর্ত্তনের পরই অবিলম্বে দক্ষিণবঙ্গের সাগর বেষ্টিত চন্দ্রদ্বীপে যাইয়া নূতন রাজ্য স্থাপিত করিলেন। প্রাকৃতিকশক্তিরক্ষিত এই নব রাজ্যে যবনগণ বিশেষ আধিপত্য লাভ করিতে পারিল না। কিন্তু সুবর্ণগ্রাম দনুজের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই হত-গৌরব হইয়া পড়িল।

দনুজ যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে তাহাই ঘটিল। সম্রাট বুলবন অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, বঙ্গদেশকে দমিত রাখিতে হইলে, আপনার আত্মীয় স্বজন কাহাকেও গৌড়ের সিংহাসনে রাখিতে হইবে। কারণ বঙ্গের ন্যায় সুবর্ণপ্রসবা ভূমিকে পরের হস্তে সঁপিয়া দিয়া এতদূর হইতে শাসন করা চলে না। এজন্য তিনি তাঁহার পুত্রকে কয়েক বৎসর যাবৎ গৌড়ের অধিপতি করিয়া রাখিলেন। সম্রাট-তনয় নাসিরুদ্দিন অনেক দিন পশ্চিমবঙ্গের শাসন-কার্য্য পরিচালনা করিলেন। কিন্তু রৌপ্য পাইতে গিয়া তিনি সুবর্ণখণ্ড হইতে বঞ্চিত হইলেন। বুলবনের মৃত্যুর পর নাসিরুদ্দিনের অনুপস্থিতিতে তাঁহারই পুত্র কাইকুবাদ সম্রাট বলিয়া ঘোষিত হইল। নাছিরুদ্দিন তেমন লোভী ছিলেন না, বিশেষতঃ ছেলে সম্রাট হইয়াছে, তিনি আর উচ্চবাচ্য না করিয়া যেমন বঙ্গেশ্বর ছিলেন, তেমন বঙ্গেশ্বরই রহিয়া গেলেন।

কাইকুবাদের রাজত্ব-কালে আর বিশেষ কিছু ঘটনা ঘটে নাই। একবার মাত্র পিতা-পুত্রে কিছু মনোমালিন্য হওয়ার উপক্রম হইয়া-

ছিল, কিন্তু সে কথায় আমাদের নিষ্প্রয়োজন। কাইকুবাদের পর দাসরাজবংশের সাম্রাজ্য নষ্ট হইল। জেলালুদ্দীন্ নামক একজন খিলিজিবংশীয় সর্দ্দার সিংহাসন অধিকার করিলেন। জেলালুদ্দীন্ তেমন অত্যাচারী ছিলেন না। তিনি নাসিরুদ্দীন্‌কেই বঙ্গের অধীশ্বর রাখিলেন। সুতরাং তাঁহার রাজত্বকালও নির্ব্বিবাদে অতিবাহিত হইল। তার পর অকৃতজ্ঞ আলাউদ্দীন্ খিলিজি স্নেহময় প্রভুর প্রাণবধ করিয়া দিল্লী অধিকার করিলেন। তাঁহার রাজত্বকাল নাসিরুদ্দীনের পক্ষে বড় সুবিধায় গেল না। দুই চারি বৎসর রাজত্ব করিয়াই তিনি আলাউদ্দীনের কোপ-নয়নে পতিত হইলেন। তখন তিনি রাজ্য ছাড়িয়া গোপনে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে বঙ্গের সিংহাসনও খালি রহিল না। নাসিরুদ্দীনের আর দুই পুত্র ছিল। প্রথম, রুকুনুদ্দীন কায়কায়ুস বঙ্গের সর্ব্বপশ্চিমাংশে আধিপত্য বিস্তার করিলেন, দ্বিতীয়, সামসুদ্দীন্ ফিরোজ সা গৌড়ে পিতৃসিংহাসনে বসিলেন। আলাউদ্দীন্ ইঁহাদিগকে বড় কিছু একটা বলিলেন না। কিন্তু হিন্দুর উপর তাঁহার চিরকাল রাগ,—গুজরাট ও চিতোরের তিনি যেরূপ সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন, এখন সুবর্ণগ্রামের শেষ হিন্দুরাজাটীরও তেমনি অবস্থা করিবার জন্য তাঁহার লোভ জাগিয়া উঠিল। ভারতের এক কোণে একটী সামান্য হিন্দুরাজ্যের অবস্থিতিও তাঁহার চক্ষুশূল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তিনি ফিরোজ সাহকে এক কূটমন্ত্রণা প্রেরণ করিলেন। তাহারই ফলে বঙ্গেশ্বর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র গায়েসুদ্দীন্ বাহাদুর সাকে সুবর্ণগ্রামে প্রেরণ করিলেন।

বাহাদুর বুদ্ধিমান্ যুবক ছিলেন, কিন্তু অত্যাচারী ছিলেন না। তিনি কৌশলে কৌশলে সুবর্ণগ্রামে আধিপত্য স্থাপিত করিলেন।

দনুজমর্দ্দনের পর বল্লাল সেন নামক এক ব্যক্তি সুবর্ণগ্রামের শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন। ইনিই ইতিহাসে দ্বিতীয় বল্লাল নামে পরিচিত। প্রথম বল্লালের সহিত ইঁহার কিছুই সংস্রব নাই। দুঃখের বিষয় আজ কাল অনেক গ্রন্থকার পুরাবৃত্ত লিখিতে যাইয়া উভয়ের মধ্যে বড় গোলমাল করিয়া বসেন, একজনের কথা অপরের ঘাড়ে চাপাইয়া একের কাহিনী অপরের :বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাঁহাদের ভিতর অনেকেই দ্বিতীয় বল্লালকে চেনেন না।—ইহাই এ গোলযোগের কারণ। এই দ্বিতীয় বল্লালই আজ কাল সুবর্ণগ্রামে পোড়া-রাজা বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত। তাঁহার কাহিনী আলোচনা করিলেই এ কথাটা সকলের বোধগম্য হইবে। এই বল্লাল সেন নেহাৎ হীন-পরাক্রম ছিলেন, এমত নহে। কিন্তু তবু তাঁহার রাজ্য রক্ষা পাইল না। কেন রক্ষা পাইল না, তাহার মোটামুটি দুইটা কারণ। প্রথমতঃ, বাহাদুর সম্রাটের বলে, বঙ্গেশ্বরের শক্তিতে বলীয়ান্। তিনি ক্রমে ক্রমে একডালা, এগার সিন্দুর প্রভৃতি সোনারগাঁর প্রধান প্রধান দৃঢ়স্থলগুলি স্ববলে অধিকার পূর্ব্বক বল্লালকে কর দিতে বাধ্য করিলেন। দ্বিতীয়তঃ, যে জন্য এরূপ ঘটিল তাহা এখানে বলিয়া দরকার নাই। সে কথাই এই গ্রন্থে ক্রমে ক্রমে প্রদর্শিত হইবে। করদ রাজা হইলেও বল্লাল সেনের ক্ষমতার বিশেষ হ্রাস হইয়াছিল না। তিনি পরাজিত হইয়া অধীনতা স্বীকার করেন নাই। ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়াই বিনাবিবাদে কর-প্রদান স্বীকারপূর্ব্বক বাহাদুরের সঙ্গে আপোষ-নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন। বাহাদুরও বল্লালের অতুল পরাক্রমের কথা অবগত ছিলেন। তিনি জানিতেন, বিবাদে জয়-পরাজয় উভয় পক্ষেই অনিশ্চিত। এ অবস্থায় বল্লাল যাহা স্বীকার করিতেছেন, তাহাই যথেষ্ট মনে করা কর্ত্তব্য। সুতরাং

তিনি আর শাসন-সংরক্ষণ ইত্যাদি রাজ্যের অন্যান্য কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলেন না। এদিকে বল্লালও সৌজন্য রক্ষা করিয়া চলিতে লাগিলেন—বাহাদুরকে কখনও কোনরূপে অসন্তুষ্ট করিলেন না। উভয়ের ভিতর মৈত্রীভাব স্থাপিত হইল। প্রজারা জানিল, হিন্দুরাজত্বই বজায় রহিল।

কিন্তু এই ভাবটা আলাউদ্দীন্ কিম্বা ফিরোজ সা কাহারও মনঃপূত হইল না। তাঁহাদের চর সর্ব্বদা নানাবেশে সুবর্ণগ্রামের নানা স্থানে নানা তত্ত্বান্বেষণে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ইতিমধ্যে আর একটা ঘটনা ঘটিল। হিজিরা ৭২২ সনে ফিরোজ সা প্রাণত্যাগ করিলেন। ফিরোজের জ্যেষ্ঠপুত্র সিহাবুদ্দীন্ পিতৃসন্নিধানেই বাস করিতেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি বাগ্‌রাখান্ উপাধিতে ভূষিত হইয়া লক্ষ্মণাবতী বা গৌড়ের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। কিন্তু তিনিও পিতৃপ্রদর্শিত পথেরই পথিক হইলেন। তাঁহারও নজর সুবর্ণগ্রামের উপর পতিত হইল। তাঁহারও গুপ্তচর সুবর্ণগ্রামের গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে ফিরিতে লাগিল। দেশের যখন ঠিক এইরূপ অবস্থা, সেই সময়ে আমাদের এই আখ্যায়িকা আরম্ভ হইয়াছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—*—

প্রেমের বিচিত্র গতি।

He is a very serpent in my way ;
And where so e'er this foot of mine doth tread,
He lies before me : Dost thou understand me ?

Shakespeare.

যখন পদ্মাবতী ও শ্যামলী চিন্তাভারক্লিষ্ট হৃদয়ে যাইয়া স্ব স্ব প্রকোষ্ঠে নিদ্রাগতা হইলেন, তখন নগরের আর একটী উপকণ্ঠে নদশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মপুত্রের অদূরে আর একটা কাণ্ড ঘটিতেছিল।

আজকাল ব্রহ্মপুত্রের যে স্রোত সুবর্ণগ্রামের ভিতর দিয়া প্রবাহিত তাহা বড় কৃশাঙ্গ। কিন্তু ইহার অবস্থা চিরকালই এমত ছিল না। বর্ত্তমান বিশালোরসা মেঘনা, বেগবতী ধলেশ্বরী এবং অনন্তবিস্তারসলিলা পদ্মানদী সকলই ইহার নিকটে হার মানিত। তখন পদ্মানদী এত বড় ছিল না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র বালিকাটি যেমন ক্রমশঃ বড় হইয়া উঠে, পদ্মাও তেমনি আজ কাল বড় হইয়া উঠিয়াছে। তাহার কারণ এই যে, পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্রের প্রকৃত স্রোত এই পথে প্রবাহিত হইত না; ময়মনসিংহের ভিতর দিয়া ইহার যে আর একটি শাখা-স্রোত ভৈরব-বাজারের নিকটে যাইয়া মেঘনার সহিত মিশিয়া গিয়াছে, সেই শাখা-পথে প্রবাহিত হইত। তখন উহাই প্রকৃত ব্রহ্মপুত্র ছিল। কালে সে পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এখন ব্রহ্মপুত্রের মূল স্রোত পদ্মানদী

দিয়া প্রবাহিত—কাজেই পদ্মা ও পূর্ব্ব-স্রোত উভয়েরই রূপান্তর হইয়াছে। পদ্মা ক্রমে ক্রমে প্রবলবেগসম্পন্না, অনন্তবিস্তারসলিলা হইয়া উঠিয়াছে, আর সুবর্ণগ্রামের ব্রহ্মপুত্র ক্রমে ক্রমে শুথাইয়া

সেই ব্রহ্মপুত্রের কূলে অনতিদূরে বিস্তীর্ণপ্রান্তরস্থ একটী বৃহৎ অশ্বথ বৃক্ষের মূলে বসিয়া একটী মনুষ্য-মূর্ত্তি। তখনও রাত্রি শেষ হয় নাই, অন্ধকারে আলোতে মিশিয়া রহিয়াছে। গাছের তলে বড় অন্ধকার। সেই অন্ধকারে মনুষ্য-মূর্ত্তি গভীর-চিন্তা-মগ্ন। মনুষ্যমূর্ত্তি পুরুষ। অঙ্গে যোদ্ধৃবেশ, বলিষ্ঠগঠন, বয়স অনুমান পঞ্চবিংশতি বৎসর হইবে। যুবক বসিয়া বসিয়া কি চিন্তা করিতেছিল, আর মধ্যে মধ্যে ওষ্ঠ দংশন করিতেছিল, এমন সময় অদূরে আর একটী মনুষ্যমূর্ত্তি দৃষ্ট হইল। যুবক তাহাকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

যে আসিল, তাহার বয়স চল্লিশ হইবে। তাহার শরীরে মুসলমান ফকিরের বেশ, মুখমণ্ডলে দীর্ঘশ্মশ্রু, মস্তকে উষ্ণীষ। সে আসিয়া বৃক্ষমূলোপবিষ্ট সেই যোদ্ধৃপুরুষকে কুর্ণিশ করিয়া কহিল, "কতক্ষণ আসিয়াছ?"

যুবক ব্যস্তসমস্ত হইয়া উত্তর করিল, "অনেকক্ষণ। এখন তোমার কথা বল। কেমন, সব শেষ হইয়াছে ত?"

আগন্তুক ভ্রুকুটি করিল। বলিল, "হাঁ, একরূপ বটে।"

যু। একরূপ কি রূপ?

আ। আজ হইতে বুঝি আমাদের সকল আশাভরসা নির্ম্মূল হইল।

যু। তবে ঔষধে কাজ করিল না?

আ। ঔষধে কাজ করিল না! আমার ঔষধ অব্যর্থ। সে কথা নহে।

যু। তবে কি? শীঘ্র বল—আমার আর ধৈর্য্য মানিতেছে না।

আ। আমাদের কার্য্য প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে।

যু। প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে?

আ। হাঁ, একটী বালিকা সকল টের পাইয়া বিজয়চাঁদকে সাবধান করিয়া দিয়াছে।

যু। বালিকা সাবধান করিয়া দিয়াছে?

আ। হাঁ, বালিকা,—বড় খুবসুরুৎ বালিকা! ততোঽধিক ধড়িবাজ!

যু। তুমি এ সকল কি কহিতেছ? একটা বালিকাই যদি টের পাইল, তবে তুমি এ কেমন অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলে?

আ। কেশবলাল, অপরাধ অস্ত্রের নহে, অপরাধ অদৃষ্টের।

যু। এ সব মূর্খের কথা। ভাল, এ বালিকা কে?

আ। বালিকা যে হউক, অতি আশ্চর্য্য বালিকা বটে—তাহাতে আর সন্দেহ নাই। দিনে দিনে, মাসে মাসে যে বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া এতাধিক প্রচ্ছন্নভাবে কার্য্য করিতেছিল—সুবর্ণ-গ্রামের অভিজ্ঞ বৈদ্যগণ যাহা কিছুতেই নির্ণয় করিতে পারেন নাই, তাহা কিনা আজ একটা ক্ষুদ্র বালিকার প্রথম দৃষ্টিতেই ধরা পড়িয়া গেল। কেশবলাল, এ বালিকা সামান্যা নহে। যে হউক, চিকিৎসাতত্ত্বে বিশেষ অভিজ্ঞা সন্দেহ নাই।

যু। তবে এ বালিকা কে, তাহাও জানিতে পার নাই?

আ। অত অধৈর্য্য হইও না। ধৈর্য্যহীন হইলেই কার্য্যসিদ্ধ হয় না। উপস্থিত কার্য্যে তোমার অপেক্ষা আমারই লাভালাভ

বেশী। আমিই তোমাকে এ পথে প্রবর্ত্তিত করিয়াছি। কিন্তু আমার যাহা সাধ্য, ততদূরই আমার পক্ষে সম্ভব, ততোঽধিক নহে। আমি চেষ্টার ত্রুটী করি নাই।

যু। এত কথা জানিলে, আর বালিকা কে, কোথা হইতে আসিল, কাহার তনয়া, কিছুই খবর পাইলে না?

আ। কি করিব? দেয়াল বাহিয়া জানেলা হইতে প্রথমে আমি এই বালিকাকে দর্শন করি—তাহাদের কথাবার্ত্তা শ্রবণ করি। তার পর বালিকা বাহির হইয়া গৃহাভিমুখে গমন করিলে, আমিও নামিয়া অনুসরণ করিতে যাই। কিন্তু এমন সময় আর একটা নূতন ঘটনা ঘটিল। সে জন্য আর অনুসরণ করা হইল না।

যু। আবার কি নূতন ঘটিল? হাসিম্, তোমার কথাগুলি আজ আমার নিকট প্রহেলিকাময় বলিয়া বোধ হইতেছে। শীঘ্র সকল কথা খুলিয়া বল—আমি ধৈর্য্য ধরিতে পারিতেছি না।

হা। তাই বলিতেছি শোন। আমি বালিকাকে অনুসরণ করিতে যাইতেছিলাম। এমন সময় হঠাৎ বোধ হইল, যেন কে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া আসিল। আমি ধরা পড়িবার আশঙ্কায় আর অগ্রসর হইলাম না। একটা বৃক্ষের নীচে লুকাইয়া থাকিয়া লোকটাকে দেখিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। তখন ধরা না পড়ি, এই ভাবে হামাগুড়ি দিতে দিতে, অতি সন্তর্পণে অন্ধকারে মিশিয়া গেলাম। তারপর যখন বুঝিলাম, আর কেহ নিকটে নাই, তখন আস্তে আস্তে নির্জ্জন পথ ধরিয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

যু। বুঝিলাম, পিছনে শত্রু লাগিয়াছে। আর সে শত্রু কে,

তাহাও বুঝিতে পার নাই। কিন্তু শোন হাসিম্, আমি অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি। আর ফিরিতে পারি না। নয়নচাঁদ থাকিতে আমার সুখ নাই—পান্না আমার হইবে না। যদি পাপ-সঞ্চয়ই করিলাম, তবে যে রত্নের লোভে এ কার্য্যে ব্রতী হইলাম, তাহা না লইয়া ফিরিব কেন? তাহা লইবই লইব। নয়নচাঁদের কি এখনও বাঁচিবার সম্ভাবনা আছে, মনে কর?

হা। বলা যায় না। যে বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট বলিয়া মনে হইতেছে। এখন আর নূতন করিয়া ঔষধ দিবার প্রয়োজন দেখি না—সে চিন্তা নাই। কিন্তু বিপদ অন্য দেখা যাইতেছে। যে দৃষ্টিমাত্র রোগ নির্ণয় করিয়া ফেলিয়াছে, সে যে রোগ আরোগ্য করিতে সক্ষম হইবে না, তাহা কিরূপে বিশ্বাস করিব? বিশেষ বালিকা বলিয়া গিয়াছে, সে রোগ আরোগ্য করিবে।

কেশবলাল গর্জ্জিয়া উঠিল। কহিল, "হাসিম্, সাবধান, ত্রুটী হইতে দিও না। যদি সুবর্ণগ্রাম লাভের আশাভরসা থাকে, যদি সিহাবুদ্দীনের প্রিয়পাত্র হইতে চাও, তবে রাত দিন চেষ্টা কর, যেরূপে পার নয়নচাঁদকে সংহার কর। খোঁজ বালিকা কে, খোঁজ তাহার ঘর কোথায়, খোঁজ সে অনুসরণকারী কে? যেরূপে পার, তা'দের বাহির কর। প্রয়োজন হইলে তাহাদেরও নিপাত কর। পান্নার জন্য আমি অগাধ জলে ডুবিয়াছি, প্রয়োজন হইলে নরকে ডুবিব—সুবর্ণগ্রাম ছারখারে দিব। কিন্তু তবু পান্নাকে চাই। নতুবা আমারও সুখ নাই, আর আর স্বরূপ বলিতেছি শুন, তোমাদেরও মঙ্গল নাই।"

হা। তুমি কি বিস্মৃত হইতেছ যে, এ আমারও কার্য্য বটে? আমি যথাসাধ্য গৌড়েশ্বরের কার্য্য সম্পন্ন করিব।

কে। চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই—চেষ্টা কর, অবশ্য কৃত-কার্য্য হইবে। মনে রাখিও, কার্য্য সফল হইলে আমি তোমার, শ্রেষ্ঠীর ধনৈশ্বর্য্য সকল গৌড়েশ্বরের, আর সুবর্ণগ্রাম পাঠানের। অকৃতকার্য্য হও—

কেশবলাল বলিতে বলিতে কেন আর বলিল না, থামিয়া গেল। তখন হাসিম্ বলিল, "জয় পরাজয়ের মালিক মনুষ্য নহেন, —খোদা। অকৃতকার্য্য হইলে তুমি কি করিবে?"

কেশবলাল হুঙ্কার দিয়া উঠিল। কহিল, "কি করিব? কি করিব জানি না হাসিম। পারি ত পৃথিবী রসাতলে ডুবাইব, সিহাবুদ্দীনের সুখের স্বপ্ন এক ফুৎকারে উড়াইয়া দিব, এক রাত্রিতে সুবর্ণগ্রাম হইতে সকল মুসলমান বিতাড়িত করিব, বল্লালকে সকল কথা কহিয়া আবার দেশের জন্য অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। কিন্তু বাঁচিব না হাসিম্, তারপর নিশ্চয় মরিব।"

হাসিম্ হাসিয়া কহিল, "এ অদ্ভুত প্রতিকার বটে! তা, তোমাকে চিন্তিত হইতে হইবে না, কেশবলাল। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আজ হইতে এক পক্ষের মধ্যে তোমাকে সুসংবাদ দিব। এখন আমি বিদায় হই।"

তখন হাসিম সেলাম ঠুকিয়া যে দিক হইতে আসিয়াছিল, সেই দিকে পুনঃ চলিয়া গেল। কেশবলালও ধীরে ধীরে কটিবন্ধ হইতে অসি নিষ্কোষিত করিয়া নদীর দিকে চলিল।

প্রেমানলে ধর্ম্মাধর্ম্ম উৎসর্গীকৃত হইল।

নবম পরিচ্ছেদ।

—*—

প্রেমের গতি।

নিরবধি বুকে থুইয়া চাহে চোখে চোখে।
এ বড়ি দারুণ শেল ফুটিয়াছে বুকে।
জ্ঞানদাস।

এই ঘটনার পরে ক্রমান্বয়ে চারি পাঁচ দিন কাটিয়া গেল। এই চারি পাঁচ দিনের প্রত্যহ পদ্মাবতী শ্যামলীকে লইয়া নিশীথে একবার করিয়া নয়নচাঁদকে দেখিয়া আসিল। ভিষক্ শয্যাগ্রহণ করিলে পদ্মাবতী ও শ্যামলী গৃহত্যাগ করিত, আবার রজনী-শেষেই চুপি চুপি প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নিজ নিজ কক্ষে শয়ন করিয়া থাকিত। এই চারি পাঁচ দিনে নয়নচাঁদ অনেকটা আরোগ্য হইয়া উঠিলেন। পদ্মাবতীর ঔষধ মন্ত্রসিদ্ধবৎ কার্য্য করিতে লাগিল। কৃতজ্ঞতায় পান্না ও বিজয়চাঁদ অভিভূত হইয়া গেলেন।

কিন্তু এই গমনাগমনে একটা অনিবার্য্য ফল ফলিল। পূর্ণা-বয়ববিশিষ্ট গর্ব্বোন্নতললাটযুক্ত গন্ধর্ব্ববৎসুকুমারদেহ বিজয়চাঁদ, ও সদ্যস্ফুটনোন্মুখী অপূর্ব্বলাবণ্যবতী স্থিরসৌদামিনীতুল্যা কিশোরী ললনা পদ্মাবতী, এতদুভয়ের সাক্ষাৎ! এ অপূর্ব্ব সম্মিলনে যাহা ঘটিবার, তাহাই ঘটিল। উভয়ে উভয়কে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। উভয়ের মধ্যে অনুরাগের সঞ্চার হইল।

কিন্তু এক দর্শনে কি প্রেম জন্মে? ঠিক প্রেম না হউক অন্ততঃ অনুরাগের সৃষ্টি হইতে পারে, প্রথমদর্শনের এতটা শক্তি আছে, এ কথা আমরা বিশ্বাস করি। যদি তা'ই না হইবে, তবে

রোমান্ বীর এণ্টনীকে দেখিয়া ক্লিওপেট্রা মজিয়াছিল কেন? একবার মাত্র সুভদ্রা-সুন্দরীকে দর্শন করিয়া পাণ্ডববীর ধনঞ্জয় জগৎ-সংসার ভুলিয়া গিয়াছিল কেন? পদ্মিনী রাণীর প্রতিমূর্ত্তি দর্পণে সন্দর্শন করিয়াই আলাউদ্দীন্ খিলিজি চিতোর ধ্বংস করিল কেন? অম্বর ও মাড়বার মিবার-সুন্দরীর রূপ-বহ্নিতে ঝাঁপ দিয়া স্ত্রীহত্যার পাতক ক্রয় করিল কেন? আর পরমযোগী পুঁথিগতপ্রাণ চন্দ্রশেখর শর্ম্মাই বা কেন একদিন মাত্র শৈবলিনীকে দর্শন করিয়া তাহার পাণি গ্রহণ করিলেন?

কেহ কেহ বলিতে পারেন, এ গুলি অনুরাগ নহে, সৌন্দর্য্যের মোহ মাত্র। তা, হউক সৌন্দর্য্যের মোহ। সৌন্দর্য্যের মোহও ত প্রেমের একটা ভিত্তি বটে। সেই দু'দিনের সাক্ষাতে একেবারে ঠিক একটা প্রণয় বা অনুরাগের সৃষ্টি না হউক, যুবকযুবতীর হৃদয়ে প্রেমের একটা অঙ্কুর রোপিত হইল; আর সেই ক্ষুদ্র অঙ্কুর বড় শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠিল। বেণীপ্রসাদের নীরস ভগ্নালয়ের নির্জ্জন কক্ষে যে পদ্মাবতী-কুসুম এতদিন মুদ্রিতহৃদয়ে অচঞ্চলশোভা বিস্তার করিতেছিল, তাহা আজ হঠাৎ এক অননুভূতপূর্ব্ব সুখ-স্পর্শে আন্দোলিত হইয়া উঠিল। পদ্মাবতীর সংসারে আত্মীয় স্বজন বড় কেহ ছিল না। ভিষক্ ভিন্ন তাহার অন্য আত্মীয় ছিল না, শ্যামলী ভিন্ন তাহার অন্য বন্ধু ছিল না। এতদ্ব্যতীত ভষগালয়ে যাহারা বাস করিত, তাহারা দাস দাসী মাত্র। এই নীরস আত্মীয়স্বজনহীন নির্জ্জন জীবন যাপন করিতে করিতে পদ্মাবতী জ্বালাতন হইয়া গিয়াছিল। পৃথিবীটাকে বড়ই নীরস ও কর্কশ বলিয়া মনে হইত। কিন্তু এই অঙ্কুরসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তাহার জীবন-নদীতে বিপরীত তরঙ্গ উঠিল। যে দিন হইতে

বিজয়চাঁদের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল, সেই দিন হইতে তাহার মনে হইল, এ সংসার দুঃখের নহে, সুখের ; অনিত্য নহে, নিত্য ; কুৎসিত নহে, সুন্দর। সেই দিন হইতে তাহার হৃদয়ে সহস্র কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল, সেই দিন হইতে পদ্মাবতী অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে অকস্মাৎ শত শত বিহঙ্গমধ্বনি অনুভব করিল। মুদ্রিত কুসুম প্রণয়ের সুখান্দোলনে প্রস্ফুটিত হইয়া জগতের আলোকে হাসিয়া উঠিল।

কেবল যে পদ্মাবতীরই এতটা হইল, তাহা নহে। আসন্নবিপদা-শঙ্কা-ক্লিষ্ট বিজয়চাঁদের হৃদয়ও আন্দোলিত হইল। দুর্দ্দিনের মধ্যে হঠাৎ একদিন সূর্য্যোদয় হইলে, মানবের মন যেমন নবালোকে উল্লসিত হইয়া উঠে এবং নব আশায় মুগ্ধ হয়, বিজয়চাঁদের হৃদয়ও পদ্মাবতী-দর্শনে সেইরূপ প্রীতিপ্রফুল্ল হইয়া উঠিল। যখন তাঁহার হৃদয় নৈরাশ্য, নিঃসহায়তা ও নিরুৎসাহের ভাবে ঘোরতর আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল, সেই সময়ে পদ্মাবতী মূর্ত্তিমতী আশার ন্যায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার হৃদয় বড় আলোকিত করিয়া দিয়াছিল ; আশা, উৎসাহ, ও সহানুভূতি ঢালিয়া দিয়া, পদ্মা বিজয়চাঁদের নীরস হৃদয়কে অকস্মাৎ বড় সরস করিয়া তুলিল। বিজয়চাঁদেরও অকস্মাৎ মনে হইল, এ সংসার দুঃখের নহে, সুখের ; অনিত্য নহে, নিত্য।

এইরূপে প্রেম সঞ্চার হইলে, ক্রমে ক্রমে উভয়ের অন্তর উভয়ে বুঝিতে পারিল। তখন লজ্জা আসিয়া সরলতাকে দূর করিয়া দিল। বিজয়চাঁদের সে মুক্ত উৎসাহপূর্ণ বাক্যালাপ, পদ্মাবতীর সে অকপট, অকুণ্ঠিত সম্ভাষণ, সকলই কমিল। অমিশ্রিত সরলতার পরিবর্ত্তে পদ্মাবতীর মুখমণ্ডলে ব্রীড়া-চিহ্ন লক্ষিত হইল, বিজয়চাঁদের প্রশান্ত মুখে চিন্তার রেখা দেখা দিল। উভয়ের দেখা-সাক্ষাৎ,

বাক্যালাপ ক্রমে কমিয়া আসিল। প্রথম প্রথম পদ্মাবতী নয়নচাঁদকে দেখিতে আসিয়া বিজয়চাঁদকে জিজ্ঞাসা পড়া করিয়া অবস্থা অবগত হইত। এখন ভ্রাতাকে ছাড়িয়া সে ভগিনীকে ধরিল। বিজয়চাঁদ পিতৃসন্নিধানে বসিয়া সর্ব্বদা সেবাশুশ্রূষা করিতেন, পদ্মাবতী সেখানে উপস্থিত হইয়া পান্নার নিকট হইতে সকল বিষয় অবগত হইয়া ঔষধ ব্যবস্থা করিতে লাগিল। ব্যবস্থা হইলে তাহাকে লইয়া যাইয়া পদ্মা ভিন্ন কক্ষে বসিয়া নানা বাক্যালাপ করিত। বিজয়চাঁদের বড় ইচ্ছা হইত, সেই বাক্যালাপে যোগদান করেন। কিন্তু পিতাকে ফেলিয়া কি করিয়া যাইবেন? বিশেষ পদ্মার নিকট যাইতে এখন আর তাঁহার পা উঠিত না। পদ্মা যখন পুনঃ রোগীর সন্নিধানে গমন করিত, তখন উৎসাহে ও অনুরাগে তাহার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিত। পদ্মা নতমুখে প্রয়োজনীয় উপদেশ প্রদান করিয়া যথাসম্ভব সত্বর আবার চলিয়া আসিত।

কিন্তু আগুন ছাপা থাকে না। ক্রমে ক্রমে কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। শ্যামলী পূর্ব্বেই কিছু কিছু বুঝিয়াছিল, এখন আরও ভাল করিয়া বুঝিল। ক্রমে পান্না বুঝিল। ক্রমে ক্রমে বেণীপ্রসাদের দাসদাসীও সে কথা জানিতে পারিল। দাস দাসী কথা জানিলে, পাড়ায় সে কথা প্রায় রাষ্ট্র না হইয়া যায় না। সুতরাং ধীরে ধীরে সে কথা বেণীপ্রসাদেরও কাণে উঠিল।

বেণীপ্রসাদ যখন এ কথা জানিতে পারিলেন, তখন হঠাৎ তাঁহার চারিদিকে বড় ঝড় উঠিল। তাঁহার মুখ গম্ভীর হইল, চক্ষু ঈষৎ রক্তবর্ণ ধারণ করিল, ক্রমে ক্রমে ললাট কুঞ্চিত হইল, মুখ বিস্ফারিত হইয়া, নিশ্বাস প্রশ্বাস অতি আস্তে বহিতে লাগিল। বেণী-প্রসাদ দাঁড়াইয়াছিলেন, ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িলেন।

কিন্তু বেণীপ্রসাদ সহসা কাহাকেও কিছু বলিলেন না; এমন কি, তিনি যে এ কথা জানিতে পারিয়াছেন, শ্যামলী বা পদ্মাবতীও সে কথা জানিতে পারিল না। দিন যেমন চলিতেছিল, তেমনি চলিয়া যাইতে লাগিল। কেবল বেণীপ্রসাদের একটা পরিবর্ত্তন এই ঘটিল যে, তিনি পূর্ব্বে বড় ঘরের বাহির হইতেন না, ব্যবসায়ের জন্য ভিন্ন কোথায়ও বেড়াইতে যাইতেন না, এই ঘটনার পর ঘন ঘন বাহির হইতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি কোথায় যাইতেন, কি করিতেন, সে খবর কেহ জানিত না।

দশম পরিচ্ছেদ।

—*—

শঠে শাঠ্যং।

আর না যাইব সই যমুনার জলে।
আর না হেরব শ্যাম কদম্বের তলে॥
জ্ঞানদাস।

বেণীপ্রসাদের সেই ভাঙ্গা বাড়ীতে একটী সুসজ্জিত কক্ষে একদিন পদ্মাবতী বসিয়া ছিল। ঘরের দেওয়ালে নানাবিধ সুরম্য ছবি চিত্রিত—নানারকম ঠাকুর, দেবতা, লতা, পাতা, হাতী, ঘোড়া, মহিষ। পদ্মাবতী বসিয়া বসিয়া অন্যমনস্কদৃষ্টিতে সেগুলির দিকে চাহিয়াছিল, আর কি ভাবিতেছিল। এমন সময় শ্যামলী ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল, "ঠাকুরাণি, কি করিতেছ?" পদ্মা অন্যমনস্ক

ছিল, একটু চমকিয়া উঠিয়া কহিল, "একখানা চিত্র দেখিতেছি।"

শ্যামলী হাসিল। কহিল, "চিত্র? তা চক্ষু চাহিয়া দেখিতেছ, না মনে মনে নিরীক্ষণ করিতেছ?"

প। মনে মনে নিরীক্ষণ—সে কিরূপ শ্যামলি?

শ্যা। এই ধ্যান করিয়া লোকে যেরূপ ইষ্টদেবতা সন্দর্শন করে।

প। মরণ আর কি! আমি কি কাহাকেও ধ্যান করিতেছি?

শ্যা। করিতেছ বৈ কি? যে দিন হইতে ভিষক্ সাজিয়াছ, সেই দিন হইতেই তোমার জপ তপ আরম্ভ হইয়াছে—সেইদিন হইতেই ওই বাহিরের চক্ষু দু'টী বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আজ কয়দিন তোমার সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিতেছি, কতবার তুমি ঠাওরই করিতে পার নাই।

পদ্মা ভ্রুকুটী করিয়া কহিল, "শ্যামলি, তোর বয়স হইল, তবু কি রঙ্গ করিবার সখ গেল না?"

শ্যামলী হাসিল। কহিল, "যাইবে না কেন, ঠাকুরাণি? আগে তোমার বিবাহ হউক, তার পর আমি রঙ্গ বন্ধ করিব।"

"বি—বা—হ!" পদ্মাবতী হাসিল, "বি—বা—হ! আমার বিবাহ কবে হবে শ্যামলি?"

শ্যা। যবে তোমার মত হইবে।

প। আমি তোর রঙ্গ তামাসার জ্বালায় অস্থির হইয়াছি, তুই পাত্র দেখ্ না, আমি এই মুহূর্ত্তে বিবাহ করিব।

শ্যামলী হাসিয়া কুট্‌পাট্ হইল। কহিল, "পাত্র? সে জন্যে আর ভাবনা? চল না, আজই তোমাকে পাত্রস্থা করি। ভাল আজ বুড়াকে দেখিতে যাইবে না?"

প। নয়নচাঁদ ত আরোগ্য হইয়া উঠিল, আর যাইয়া কি হইবে? রোজ রোজ যাওয়াটা ভাল দেখায় কি শ্যামলি? বিশেষ রাত্রিতে আজ কাল পথ চলা দায় হইয়া উঠিয়াছে।

পদ্মা একথা কহিল বটে, কিন্তু শ্যামলী বুঝিল, এ তাহার অন্তরের কথা নহে। শ্যামলী বড় দুষ্ট; কহিল, "তা বেশ, আমিও সেই কথাই জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিলাম। তুমি যাইবে না, ভালই হইল। আজ একবার মাসীর বাড়ী বেড়াইতে যাইব, ইচ্ছা আছে।" এই বলিয়া শ্যামলী গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। কিন্তু একটু যাইতেই পদ্মা আবার তাহাকে ডাকিয়া ফিরাইল। কহিল, "রোস্ রোস্, ভাবিয়া দেখি। ভাল, আজিকার দিনও যাইতে হইবে দেখিতেছি, একটা ঔষধ দিয়া আসিতে ভুলিয়া গিয়াছি। তোর আর মাসীর বাড়ী যাওয়া হইল না।"

শ্যামলী মুচ্‌কি হাসিয়া কহিল, "তবে থাক্, কালই না হয় সেখানে যাইব। এখন তা হ'লে এসো তোমার চুলটা ভাল করিয়া বাঁধিয়া দেই।"

তখন শ্যামলী পদ্মার বিশেষ আপত্তি সত্ত্বেও মনোযোগসহকারে চুল বাঁধিতে বসিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—*—

ধূম হইতে অগ্নি বাহির হইল।

ধনি, হেন তৃষাতুরে ছাড়িয়ে কি যাবে?

হেমচন্দ্র।

সেই দিন রাত্রিতে নয়নচাঁদের অবস্থা পরীক্ষানন্তর পদ্মাবতী যখন কক্ষান্তরে আসিয়া পান্নার সহিত গল্প জুড়িয়া দিল, তখন শ্যামলী বিজয়চাঁদের সহিত একটা গভীর কথোপকথনে প্রবৃত্ত। উভয়ের ভিতর কি বাক্যালাপ হইতেছিল, সে বিষয় পাঠকের জানিবার দরকার নাই। বাক্যালাপ শেষ হইলে, উভয়ে আসিয়া পদ্মাবতী ও পান্নার নিকট উপস্থিত হইল। বিজয় কহিলেন, "পান্না, রোগীর গৃহে একজন কেহ থাকা ভাল; তুমি যাইয়া ক্ষণকাল তথায় অপেক্ষা কর, আমি শীঘ্র আসিতেছি।"

পান্না পদ্মাবতীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেল। পান্না চলিয়া গেলে, শ্যামলী কহিল, "ঠাকুরাণি, ভিতরে বড় গরম বোধ হইতেছে, আমিও একটু বাহিরে ঠাণ্ডা হইয়া আসি। তুমি ততক্ষণ প্রস্তুত হও।"

শ্যামলীও কক্ষ পরিত্যাগ করিল।

তখন বিজয়চাঁদ ডাকিলেন, "পদ্মা!"

বহুদিন পদ্মা বিজয়চাঁদের সহিত চারি চক্ষু মিলাইয়া কথা কহে নাই। আজ এই অসম্ভাবিত নির্জ্জন সাক্ষাতে হঠাৎ তাহার হৃদয়-তন্ত্রী বড় কাঁপিয়া উঠিল। পদ্মার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। পদ্মা কথা

কহিতে পারিল না—স্থির, গম্ভীর দৃষ্টিতে বিজয়চাঁদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

বিজয় আবার কহিলেন, "পদ্মা, তুমি নাকি আর আসিবে না?"

পদ্মা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, একবার মনে মনে কহিল, "হে ভগবান, হে প্রভো, সত্য সত্যই কি আজ হতভাগিনীর প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিয়াছ? সত্য সত্যই কি আজ জল না চাহিতেই মেঘ বর্ষণ করিলে? সত্য সত্যই কি আজ দুঃখিনীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে উদ্যত হইয়াছ?"

তার পর কষ্টে আপনাকে সংযত করিয়া আস্তে আস্তে কহিল, "কেন বিজয়চাঁদ, আমার কার্য্য ত প্রায় শেষ হইয়াছে। তোমার পিতা বিপন্মুক্ত।"

বি। তোমার কার্য্য শেষ হইয়াছে, কিন্তু আমার কার্য্য?

প। তোমার আবার কি কার্য্য বিজয়?

বি। তুমি চিকিৎসক, রোগীর রোগ দূর করিয়াছ, আমি এখন তাহার পুরস্কার দান করিব না?

প। বিজয়চাঁদ, আমি বেণীপ্রসাদের কন্যা।

বি। উত্তম। বেণীপ্রসাদের ঋণ কি নয়নচাঁদ অপরিশোধিত রাখিবে পদ্মা?

প। ভাল, কিরূপে তুমি সে ঋণ পরিশোধ করিবে ভাবিয়াছ?

বি। তুমি আমার পিতৃজীবন দান করিয়াছ, আজ আমি তোমায় তৎপরিবর্ত্তে আর একটী জীবন দান করিব। গ্রহণ করিবে না?

আবার পদ্মার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। আবার তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, পদ্মার মুখ আবার আরক্ত হইয়া উঠিল, মস্তক

নত হইল—পদ্মা আপনা :বিস্মৃত হইল। পদ্মা উত্তর করিতে পারিল না।

বিজয় আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "গ্রহণ করিবে না, পদ্মা ?"

পদ্মা তবু নিরুত্তর।

তখন বিজয়চাঁদ আবেগভরে যাইয়া পদ্মাবতীর সুকুমার কর-পল্লব ধারণ করিলেন। আপনার অঙ্গুলীতে একটী উৎকৃষ্ট হীরকাঙ্গুরীয়ক দীপালোকে ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছিল; বিজয়চাঁদ সেই অঙ্গুরীয়কটী খুলিয়া ধীরে ধীরে পদ্মাবতীর একটী অঙ্গুলীতে পরাইয়া দিতে লাগিলেন। পদ্মা কম্পিত কলেবরে সে উপহার গ্রহণ করিল। উপহার গ্রহণানন্তর ধীরে ধীরে লজ্জাবনত বদনখানি ঊর্দ্ধে উত্থিত করিয়া বিজয়চাঁদের দিকে চাহিয়া কহিল, "কি করিলে বিজয়চাঁদ ? কেন এ কাজ করিলে ? অপাত্রে সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিলে ?"

পদ্মাবতীর কথা কয়টী বিজয়চাঁদের কর্ণে অমৃতসিঞ্চন করিল। সেই সঙ্কুচিত দৃষ্টি, সেই অর্দ্ধোচ্চারিত কোমলকণ্ঠনিঃসৃত প্রেম-পরিপূর্ণ ক্ষুদ্র উত্তর, প্রভাতমিহিরচ্ছটাভ নিবিড়কৃষ্ণচিকুরজাল-বেষ্টিত ব্রীড়াসংক্ষুব্ধ সেই ক্ষুদ্র বদনচন্দ্রমা বিজয়চাঁদের রুদ্ধ আবেগ সহসা মুক্ত করিয়া দিল। উপলখণ্ডরুদ্ধ প্রস্রবণধারা কোনরূপে অকস্মাৎ বিমুক্তপথ হইলে, যেমন কলকল ধ্বনিতে চারিদিক প্রতি-ধ্বনিত করিয়া, সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম পূর্ব্বক প্রবলবেগে ধাবিত হয়, পদ্মাবতীর এই ক্ষুদ্র উত্তরে বিজয়চাঁদের চিররুদ্ধা-বেগও তেমনি হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া, লজ্জা, মান, অভিমানের সকল বাধাবাধ ভাঙ্গিয়া প্রবাহিত হইল।

বিজয় উত্তর করিলেন, "কি করিয়াছি জানি না পদ্মা; হৃদয়ে

দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি,—সে প্রবৃত্তির প্ররোচনায় যাহা ভাল বোধ হই-য়াছে, তাহাই করিয়াছি। আর অপাত্রের কথা কহিতেছ? অপাত্র! অপাত্রে আমি হৃদয় স্থাপন করি নাই। শোন পদ্মা, আজ পক্ষাধিক হইল তোমার সহিত পরিচয় হইয়াছে, সেই অবধি প্রতিদিন তুমি আমাদের আলয়ে যাতায়াত করিতেছ। তুমি বেণীপ্রসাদের কন্যা। বেণীপ্রসাদ আমাদের বন্ধু নহেন, তবু তুমি কত কষ্ট সহিয়া তাহার অগোচরে আমাদের উপকার করিতেছ। আমার পিতা মরিতে বসিয়াছিলেন, হয়ত তুমি ঔষধ না দিলে তিনি নিশ্চিত মরিতেন; তুমিই দয়া করিয়া আমাদিগকে পিতৃহীন হইতে দেও নাই; তুমিই তাঁহাকে জীবন দান করিয়াছ, তোমারই যত্নে তিনি ক্রমে আরোগ্যলাভ করিতেছেন। কেবল তাহাই নহে পদ্মা, আরও শোন। তুমি যে দিন হইতে এ গৃহে পদার্পণ করিয়াছ, সেইদিন হইতে এ গৃহের বিষাদ-তমসা একেবারে দূর হইয়া গিয়াছে, আর তৎপরিবর্ত্তে এক অপূর্ব্ব আনন্দময়ভাব জাগরিত হইয়া উঠিয়াছে। সে আনন্দস্রোতে আমার হৃদয় ভরিয়া গিয়াছে, উৎসাহ উদ্যম জাগিয়া উঠিয়াছে, জগৎ নূতনভাব ধারণ করিয়াছে, বসন্তের কলধ্বনিতে মন নাচিয়া উঠিয়াছে, এক অপূর্ব্ব আশা-মরীচিকা আমাকে প্রতি মুহূর্ত্তে প্রলোভিত করিতেছে! এ সকল কি বৃথাই হইতেছে, পদ্মা? এ স্বপনের ছবি, কল্পনার মোহময়ী মূর্ত্তি, আশার প্রলোভন, মনের দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি, হৃদয়ের প্রমত্ত আবেগ, এ সকল কি সফল হইবে না, পদ্মা?”

বলিতে বলিতে বিজয় একটু থামিয়া একবার ঢোক গিলিলেন। তার পর আবার কহিতে লাগিলেন,—“পিতা ক্রমে আরোগ্যলাভ করিতেছেন,’ জগদীশ্বর করেন তিনি আরও সত্বর পূর্ণস্বাস্থ্য লাভ

করিয়া উঠুন। কিন্তু পদ্মা, তাঁহার আরোগ্যের সঙ্গে সঙ্গে আমার উপর এক নূতন বিষাদ-তিমির ঘনাইয়া আসিতেছে। তাঁহার আরোগ্যের সঙ্গে সঙ্গে তোমার কার্য্য শেষ হইতেছে। তুমি হয়ত এখন আর আমাদিগকে দেখিতে আসিবে না—ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। হয়ত, ক্রমে ক্রমে ভুলিয়া যাইবে। পদ্মা, তুমি বেণী-প্রসাদের কন্যা, আমাদের শত্রু-দুহিতা। তোমাকে লাভ করিবার আশা আমার পক্ষে বাতুলতা মাত্র। কিন্তু ভালবাসা কখনও বাধা প্রতিবন্ধক চিন্তা করিয়া কাহাকেও আশ্রয় করে না। তোমাকে পাই, না পাই, তোমাকে ভাল বাসিয়াও আমার যে আনন্দ, তাহার উপমা নাই। পদ্মা আমি তোমার মন জানি না; কিন্তু আমার হৃদয় বলিতেছে, তুমিও আমাকে প্রীতির চক্ষে দর্শন কর। যদি একথা সত্য হয়, তবে আজ তোমাকে একটা অনুরোধ করিতেছি, পালন করিও। এতদিন যেমন কৃপা পূর্ব্বক দর্শন দান করিয়া এ হৃদয় আলোকিত করিয়াছ, ভবিষ্যতেও যেন তেমনি মাঝে মাঝে দেখা দিতে ভুলিও না; আমার এ মুগ্ধচিত্তে শান্তি সিঞ্চন করিতে কুণ্ঠিত হইও না। পদ্মা, এখন রাত্রি হইয়াছে, আর তোমায় আবদ্ধ করিয়া রাখিব না। কিন্তু শেষ একটা অনুরোধ রক্ষা করিয়া যাও, একবার বলিয়া যাও পদ্মা, আমায় কি তুমি ভাল বাস?”

অবনত মস্তকে, কম্পিত দেহে, মুগ্ধ চিত্তে পদ্মাবতী এই আবেগময়কাহিনী শ্রবণ করিল। বিজয়চাঁদের শেষ প্রশ্নের উত্তরে সহসা সে কোন উত্তর করিতে পারিল না। তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, জিহ্বা, কণ্ঠ বড় অবাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। বিজয় আবার প্রশ্ন করিলেন। আবার পদ্মা নীরব রহিল।

তখন বিজয় ধীরে ধীরে পদ্মাবতীর নিকট জানু গাড়িয়া উপ-

বেশন করিলেন। তার পর আবার গদ্গদকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, “পদ্মা উত্তর দাও, শেষ এক কথা কও—তুমি কি আমায় ভাল বাস?”

তখন অতি সঙ্কুচিত ভাবে, অতি ধীরে, অতি মধুরে, পদ্মা উত্তর করিল। একটী অতি ছোট উত্তর করিল,—“বাসি।” সেই ক্ষুদ্র উত্তর বিজয়চাঁদের কর্ণে বীণাধ্বনি করিয়া উঠিল, প্রাণে অজস্র মধু ঢালিয়া দিল, জগৎ ব্রহ্মাণ্ড সকল প্রতিধ্বনিত করিয়া বিজয়চাঁদের কর্ণে কেবলি বাজিতে লাগিল,—“বাসি।”

বিজয়চাঁদ কহিলেন, “তবে মাঝে মাঝে দেখা দিতে ভুলিবে না?”

প। না।

বি। আমায় বিস্মৃত হইবে না?

প। না।

তখন উভয়ে উভয়ের হস্তে হস্ত মিশাইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই নির্জ্জন কক্ষে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। পলে পলে কাল বহিয়া যাইতে লাগিল। কেহ টের পাইল না—কেহ গ্রাহ্য করিল না—কেবলি দাঁড়াইয়া রহিল। দেশ, কাল, অবস্থা, আপন, পর, বিশ্ব, ব্রহ্মাণ্ড সেই নিস্তব্ধতায় ডুবিয়া গেল। তবু উভয়ে দাঁড়াইয়া রহিল, কেবলি দাঁড়াইয়া রহিল। বাহির হইতে শ্যামলী ডাকিল, “ঠাকুরাণি!”

তখন উভয়ের চমক ভাঙ্গিল। তখন উভয়ে উভয়ের কর হইতে কর মুক্ত করিয়া সে রাত্রির জন্য বিদায় গ্রহণ করিল।

দ্বিতীয় খণ্ড।

অদৃষ্টের উপহাস।

সখি, কি মোর কপালে লিখি!
শীতল বলিয়া, ও চাঁদ সেবিনু,
ভানুর কিরণ দেখি॥

চণ্ডীদাস।

বঙ্গ-বিজয়।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—*—

বিনামেঘে বজ্রপাত।

O hell! to choose love by another's eyes!

Shakespeare.

The kirk was deck'd at morning-tide,
The tapers glimmer'd fair;
The priest and bridegroom wait the bride,
And dame and knight are there:

Sir W. Scott.

পদ্মাবতী ও শ্যামলীতে কথোপকথন হইতেছিল। তখন সূর্য্যদেব অস্তগত-প্রায়; সন্ধ্যা সমাগতা।

প। শ্যামলি, এ চোরাই ব্যবসায় কত দিন চলিবে? এ যে চোরাই মাল, চোরাই সওদাগর, চোরাই মহাজন!

শ্যা। না চলে মহাজন বদলাও। একটা নূতন মহাজন ডাকিব কি?

প। কেন? তুই নিজে বুঝি আর একটা ব্যবসা খুলিবি?

এই বলিয়া পদ্মা দুই হাতে সতেজে শ্যামলীর গলা টিপিয়া ধরিল।

শ্যামলী কহিল, "ছাড়, ছাড়। ও কি করিতেছ?"

প। তোমার মত মন্ত্রী থাকিলে ব্যবসায়ীর ভাবনা নাই—উপযুক্ত মন্ত্রণার উপযুক্ত পুরস্কার দিতেছি।

শ্যামলী হাসিল। কহিল, "ব্যবসায়ের প্রারম্ভেই যদি এত পুরস্কার, তা' হইলে ব্যবসা টিকিবে কেন? আগে তোমার ব্যবসায়ে লাভ হউক, তার পর যত পার পুরস্কার দিও—সহ্য করিব।"

প। আমার ব্যবসায়ে লাভ হইবার নহে। আমি লাভের প্রত্যাশা করিয়া ত ব্যবসা খুলি নাই।

শ্যা। লাভের প্রত্যাশা না করিয়া কোনও বুদ্ধিমান্ বণিক্ই ব্যবসায় খোলে না। তুমি ত পাকা সওদাগর, উত্তম খনি চিনিয়া তবে ব্যবসায়ে হাত দিয়াছ—তোমার বিশেষ লাভ হইবে।

পদ্মাবতী হাসিল। কহিল, "সত্য কহিয়াছিস্ শ্যামলি—খনি উত্তমই বটে। কিন্তু সওদাগর যে বড়ই অধম। মূলধন মোটেই নাই—মাটী কাটিয়া রত্ন উদ্ধার করিব কিসে? আমার মূলধন কৈ?"

শ্যা। সর্ব্বস্ব বেচিয়া মূলধন সংগ্রহ কর! যদি রত্ন চিনিয়া থাক, সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিতে ক্ষতি কি?

প। যদি শেষটা লোকসান হয়?

শ্যা। লাভ লোকসান ভগবানের হাত। অত ভাবিলে ব্যবসা চলে না। ব্যবসায় করিলেই লাভ লোকসান হইবে। কিন্তু ও কি?—ও দিকে ও কি হইতেছে?

এমন সময় বাহিরে হঠাৎ মঙ্গলবাদ্য বাজিয়া উঠিল। সেই ধ্বনি শ্রবণ করিয়া উভয়ে চমকিয়া উঠিল। পদ্মাবতী কহিল, "এ যে বিবাহের শানাই! দেখ্‌তো, কি হইল।"

শ্যামলী বাহিরে যাইতেছিল, কিন্তু আর যাইতে হইল না। সেই সময় একজন পরিচারিকা গৃহে প্রবেশ করিয়া কহিল, "ঠাকুরাণি, শীঘ্র আইস, তোমায় প্রভু ডাকিতেছেন। দেখ চেয়ে, কি সব কাণ্ড কারখানা হইতেছে!"

বেণীপ্রসাদ বহির্ব্বাটীতে থাকিতেন। সেখানে তাঁহার জন্য একটী স্বতন্ত্র বাস-ভবন ছিল। পদ্মা যাইয়া সেইখানে উপস্থিত হইল। যাইতে যাইতে সে বড় আশ্চর্য্য হইয়া গেল। দেখিল, বহির্ব্বাটীর সর্ব্বত্র মঙ্গলচিহ্ন শোভা পাইতেছে, চারিদিকে মঙ্গলোপচারাদি কে সাজাইয়া রাখিয়াছে, মধ্যে মধ্যে দু'চারিটী অপরিচিত ব্যক্তি চলা-ফিরা করিতেছে। পদ্মা কিছুই বুঝিতে পারিল না। অন্যমনস্কভাবে পিতৃ-গৃহে প্রবিষ্ট হইল।

গৃহে প্রবেশ করিয়া পদ্মা আরও আশ্চর্য্য হইল। দেখিল, সমগ্র গৃহখানি অতি উত্তমরূপে সজ্জিত হইয়াছে, চারিদিকে অসংখ্য প্রদীপ জ্বলিতেছে, মেজেতে মৃত্তিকোপরি নানাবিধ শুভকর্ম্মোপচারাদি শোভা পাইতেছে। পদ্মা গৃহে প্রবেশ করিতেই বেণীপ্রসাদ ডাকিলেন,—"মা, এই দিকে এস।"

পদ্মা বেণীপ্রসাদের নিকট যাইয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, এ সব কি হইতেছে?"

বে। বলিতেছি মা; বলিব বলিয়াই তোমাকে ডাকিয়াছি। আজ তোমায় একটী গুরুতর কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে।

পদ্মা আরও বিস্মিত হইল। কহিল, "কি কর্ত্তব্য বাবা?"

বে। আমি তোমার পিতা—চিরমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। আজ আমি তোমাকে যে কার্য্য করিতে বলিব, তাহা তোমার চিরমঙ্গল-তরে বলিয়া জানিবে। আমার কথার অন্যথা করিও না।

প। আজ্ঞা করুন।

বে। আজ তোমাকে বিবাহ করিতে হইবে।

বিবাহ! পদ্মাবতী আকাশ হইতে পড়িল। যদি সেই মুহূর্ত্তে পদ্মাবতীর চরণতল হইতে সমস্ত পৃথিবীটা সরিয়া যাইত, আর সে অগাধ অনন্তে ডুবিত, তবু বুঝি পদ্মার অধিকতর বিস্ময়ের কথা ছিল না। পদ্মা বজ্রাহতবৎ উত্তর করিল, "বিবাহ!"

বে। হাঁ, মা বিবাহ। আশ্চর্য্য হইও না। তুমি বয়স্থা হই-য়াছ—বিবাহ করিতেই হইবে।

প। আজই বাবা?

বে। এই মুহূর্ত্তেই। আমি সকল প্রস্তুত রাখিয়াছি, তুমি প্রস্তুত হও। আর এক কথা, নানা কারণে কাজটা একটু গোপনে করিতে হইতেছে। এ বিবাহ বাহিরের লোকে জানিতে পারিবে না। তাই এই নির্জ্জন স্থলে সকলের অসাক্ষাতে আজ কার্য্য সম্পন্ন করিব।

প। পিতা, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমাকে ভাবিবার সময় দিন্।

বে। অসম্ভব। আমি তোমার পিতা, আমি যাহা করি-য়াছি, বিশেষ ভাবিয়া চিন্তিয়াই করিয়াছি। এতদুপরি তোমার [illegible]-চিন্তার দরকার নাই—অবসর নাই।

এই অসম্ভব ব্যাপার, অসম্ভব কথা,—দেখিয়া শুনিয়া পদ্মাবতী চারিদিকে অন্ধকার দেখিল। কিরূপে সে এখন নিজের ধর্ম্ম রক্ষা

করিবে, ভাবিয়া আকুল হইল। বিবাহ? পদ্মা কাহাকে বিবাহ করিবে? পদ্মার জীবন যে বহুদিন পূর্ব্বেই বিক্রীত হইয়া গিয়াছে! বুদ্ধিহীনা পদ্মা ভাবিল, তাহার স্নেহময় পিতা সে সকল কথা অবগত নহেন বলিয়াই বুঝি এত অনর্থ ঘটাইয়াছেন। সকল কথা জানিলে হয় ত তিনি এত কঠোর হইবেন না। বিজয়চাঁদকে বেণীপ্রসাদ ঘৃণা করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার নিকট তাঁহার নাম বলিবার প্রয়োজন কি? পদ্মাবতী অন্যগতপ্রাণা এ কথা জানিলেই কি বেণীপ্রসাদ স্নেহময়ী দুহিতাকে অপর পুরুষের করে অর্পিত করিতে বিরত হইবেন না? পদ্মাবতী এই ভাবিয়া একটু হর্ষপ্রফুল্ল হইল। হা নির্ব্বোধ পদ্মাবতি, তোমার এ বালুকার বাঁধ কতক্ষণ টিকিবে?

পদ্মাবতীকে নীরব থাকিতে দেখিয়া বেণীপ্রসাদ আবার কহিলেন, "কি ভাবিতেছ পদ্মা, আমি তোমার জন্য রাজতুল্য বর সংগ্রহ করিয়াছি। যাঁহার হস্তে তোমাকে সমর্পণ করিব ভাবিয়াছি, সমগ্র সুবর্ণগ্রামে তত্তুল্য ব্যক্তি দ্বিতীয় নাই। শৌর্য্যে, ঐশ্বর্য্যে তিনি কাহারও ন্যূন নহেন। তোমার অতি সৌভাগ্য, তাই এমন ব্যক্তিকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইবে। তিনি ইতিপূর্ব্বেই এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন, এখনি এ গৃহে প্রবেশ করিবেন। সুতরাং আর সময় নাই, প্রস্তুত হও। এখনি শুভকার্য্য নিষ্পন্ন হইবে।

তখন বেণীপ্রসাদ একটী সঙ্কেত-ধ্বনি করিলেন। সেই সঙ্কেত-ধ্বনি হওয়া মাত্র, কক্ষের ভিতরের দিকের একটী যবনিকা আন্দোলিত হইয়া উঠিল। সেই যবনিকার অন্তরাল হইতে ধীরে ধীরে একটী অজানুবর্ম্মপরিহিত রূপবান্ যোদ্ধৃ-

পুরুষ ভিতরে প্রবিষ্ট হইলেন। যোদ্ধার মণিময় কিরীট অসংখ্য দীপরশ্মিসম্পাতে সহসা উজ্জ্বল প্রভায় চারিদিক প্রদীপ্ত করিয়া তুলিল।

বেণীপ্রসাদ তাঁহার দিকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "আর্য্যপুত্র, এই দিকে আসুন।"

তারপর কন্যার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "পদ্মা, চক্ষু মেলিয়া দেখ, এই রূপবান্ যুবকে আমি তোমায় অর্পণ করিব। এই উত্তম পুরুষ তোমার পাণিগ্রহণাভিলাষী।"

পদ্মা অবনত মস্তক উর্দ্ধে উথিত করিয়া যুবকের প্রতি চাহিল। হঠাৎ তাহার ব্রীড়া-সঙ্কুচিত মুখ ভীতি-বিহ্বল ভাব ধারণ করিল। পদ্মাবতী কম্পিত হইল। পদ্মা কি স্বপ্ন দেখিতেছে? এ যে সেই নিশীথে দৃষ্ট অনুসরণকারী ফকির! আগন্তুকের বেশপরিবর্ত্তন পদ্মাকে প্রতারিত করিতে পারিল না। পদ্মা ঠিক চিনিল—এ সেই ফকির, আর কেহ নহে।

পদ্মা উন্মত্তবৎ চিৎকার করিয়া উঠিল। কহিল, "পিতা, পিতা, আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? আমি কিছুতেই ইঁহাকে বিবাহ করিতে পারিব না। আমায় ক্ষমা করুন—আমায় ক্ষমা করুন।"

পদ্মা বসিয়া পড়িল। বেণীপ্রসাদও কতকটা আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, কিন্তু কোন প্রকার চঞ্চলতা প্রকাশ করিলেন না। বেণী-প্রসাদ আরক্ত, ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ অথচ সংযত। তিনি ধীরে ধীরে কন্যার সম্মুখীন হইয়া গম্ভীর বচনে কহিলেন, "পদ্মা, আমি তোমার পিতা; পিতার আজ্ঞা অবহেলা করিবে?"

পদ্মা সেইরূপ বসিয়াই নতমস্তকে উত্তর করিল, "পিতা, অন্য আদেশ করুন।"

বেণী। কখনও নহে। আদেশকারী কখনও আদেশ-পালকের মতামত গ্রহণ করিয়া আদেশ করে না। তোমাকে এ আদেশই পালন করিতে হইবে।

পদ্মা। পিতা—পিতা—

পদ্মা কি কহিতে যাইতেছিল, আর কহিল না। বেণীপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কহিবে পদ্মা ?"

পদ্মা নীরব। বেণীপ্রসাদ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলিতেছিলে ?"

পদ্মা তবু নীরব।

বেণীপ্রসাদ কিছু উত্তেজিত স্বরে অতঃপর কহিলেন, "তুমি কি কহিবে, আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু আমি তোমার কোন কথাই শুনিতে যাইব না। উঠ, প্রস্তুত হও, সময় নাই, আমার সঙ্গে আইস।"

পদ্মা কাঁপিয়া উঠিল। মৃত্তিকাসংবদ্ধ দৃষ্টিতে অর্দ্ধ উত্তেজনায়, অর্দ্ধ নৈরাশ্যে, সে তখন উত্তর করিল, "এ অসম্ভব পিতা, অসম্ভব, তাহা হইলে আমার ধর্ম্মনষ্ট হইবে—আমি অন্যগতা হইব।"

অকস্মাৎ কক্ষটী বড় নীরব-ভাব ধারণ করিল। কোনদিকে শব্দমাত্র নাই—সকলেই আশ্চর্য্য, স্তম্ভিত, বাক্যশূন্য। বেণীপ্রসাদের চক্ষুদ্বয় হইতে অগ্নি বর্ষিত হইতে লাগিল, আগন্তুক পুরুষ চঞ্চলভাবে অধর দংশন করিলেন, পদ্মা মাটীর সঙ্গে মিশাইয়া যাইতে চাহিল। সকলেই বুঝিল, এ প্রলয়ের পূর্ব্বকালীন নিস্তব্ধতা মাত্র। বিদ্যুৎ চমকিতেছে, শীঘ্রই বজ্রধ্বনি হইবে, ঝড় বৃষ্টি ছুটিবে।

ক্ষণকাল পরেই বেণীপ্রসাদ গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "কি সর্ব্বনাশি, শেষকালে কি নিজ মুখেই নিজ কলঙ্ক-কাহিনী

প্রকাশ করিলি? কিন্তু তোর আশা মিথ্যা। আমি সকলই অবগত আছি; আমি কখনও তোকে বিজয়চাঁদের হস্তে সমর্পণ করিব না—করিতে পারিব না। যাহা অসম্ভব, তাহার আশা পরিত্যাগ কর। বিজয়চাঁদের সঙ্গে কিছুতেই এ জন্মে তোমার মিলন হইবে না। বিজয় আমার বৈরিপুত্র—কিন্তু তাই বলিয়াই নহে। ইহার অন্য কারণ আছে। সে কারণ আমি এখন তোমায় জানাইতে পারিব না—জানিতে চাহিয়োও না; যদি মঙ্গল চাও, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জনকের কথা শুন—অবাধ্যতা পরিত্যাগ কর—এই গুণবান্ পুরুষে আত্ম-সমর্পণ কর।"

বেণীপ্রসাদের বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া পদ্মা বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিতা হইল। তবে কি বেণীপ্রসাদ সকলই অবগত আছেন? পদ্মা বড় সঙ্কুচিতা হইয়া গেল; কিন্তু একটু হাফ্ ছাড়িয়াও বাঁচিল। মুখরা পদ্মা লজ্জার মাথা খাইয়া পিতার নিকট আপনার প্রেম-কাহিনী ব্যক্ত করিবার জন্য প্রাণপণ করিতেছিল, এখন সে দায় হইতে বাঁচিয়া গেল। কিন্তু এখনও তাহার বিপদের শেষ হয় নাই। পিতার এ সর্ব্বনাশকর আদেশ হইতে পদ্মা কি করিয়া নিষ্কৃতি পাইবে? পিতার এ দৃঢ় প্রতিজ্ঞার বিরুদ্ধে পদ্মা কি উত্তর দিবে? পদ্মা কতক্ষণ ভাবিল। তার পর ধীরে ধীরে উত্তর করিল, "পিতা, এ ব্যক্তি কে? আপনি কাহাকে গুণবান্ কহিতেছেন? আমিও ইহার সম্বন্ধে কিছু কিছু অবগত আছি—এ এব্যক্তির স্বরূপ নহে—আপনি নিশ্চয় প্রতারিত হইয়া থাকিবেন; ইহাকে কখনও বিশ্বাস করিবেন না।"

আগন্তুক এতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। পদ্মাবতীর কথা শুনিয়া তাঁহারও মুখে বড় উদ্বেগের চিহ্ন প্রকটিত

হইতেছিল। এক্ষণে তিনি হঠাৎ বেণীপ্রসাদের সম্মুখীন হইয়া দৃঢ়স্বরে কহিলেন, “বৈদ্যরাজ, তুমি আমায় প্রতারণা করিয়াছ?”

বে। আর্য্যপুত্র, ক্ষমা করুন, আমি ইহাকে এখনই বশীভূত করিব। পদ্মাবতী আপনারই।

আ। আমি ইহাকে গ্রহণ করিব না।

বে। আমি সকল প্রস্তুত রাখিয়াছি।

আ। তুমি বিজয়চাঁদের জন্য লোক প্রেরণ কর। আমি চলিলাম। আর অপেক্ষা করিতে পারিতেছি না।

এই বলিয়া আগন্তুক সত্য সত্যই গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। বেণীপ্রসাদ ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন, “হত-ভাগিনি, নিজের সর্ব্বনাশ নিজে করিলি, নিজের পায় নিজে কুড়াল মারিলি? বিজয়চাঁদকে ভাল বাসিয়াছিস্? হা ভগবান! হা অদৃষ্ট! এ কি অদ্ভুত উপহাস! যা, এখন যাইয়া কর্ম্মফল ভোগ কর্। আজ হইতে তোর দায় আমার ফুরাইল।”

বাদ্যভাণ্ড থামিয়া গেল। সেই অসংখ্য আলোক নির্ব্বাপিত হইল। বেণীপ্রসাদ জ্বলন্ত অঙ্গারখণ্ডের মত আপন উত্তাপে আপনি দগ্ধ হইতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—∞—

বন্দিনী।

আসিয়ে সাগরতটে, ভাসাইয়ে ডিঙি,
ক্রোশেক দুক্রোশ পথ বাহিয়ে চলিল ;
হেমচন্দ্র।

নয়নচাঁদ ক্রমে আরোগ্য লাভ করিতেছিলেন, একথা বলা হইয়াছে ; কিন্তু এ ভাব অধিক দিন স্থায়ী হইল না। হঠাৎ এক দিন আবার ভাবান্তর হইল—আবার উৎকট বিষের জ্বালায় নয়নচাঁদের দেহ আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল।

কিন্তু কেন এরূপ হইল ?

যে দিন বিজয়চাঁদ পদ্মাবতীর নিকট জানিতে পারিয়াছিলেন যে, কেহ তাঁহার পিতাকে হত্যা করিবার জন্য বিষপ্রয়োগ করিতেছে, সেইদিন হইতেই তিনি এই ভীষণ রহস্যোদ্ধারের জন্য নানা গুপ্তানুসন্ধান করিতেছিলেন, সেই দিন হইতেই তিনি রোগীর গৃহের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। তাহাতে আততায়ী ধরা না পড়িলেও কতকটা কাজ হইয়াছিল। নয়নচাঁদ ক্রমে আরোগ্য হইয়া উঠিতেছিলেন। তবে এরূপ হইল কেন ?

পদ্মাবতী কহিয়াছিল, তাহার কাজ শেষ হইয়াছে—আর ঔষধের দরকার হইবে না—নয়নচাঁদ অম্নি অম্নি আরোগ্য হইবেন। বাস্তবিকও তাহাই হইতেছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে বিজয়চাঁদের কিছু অন্যমনস্কভাব পুনঃ অনর্থ ঘটাইল। পিতা আরোগ্য হইয়া উঠিয়াছেন, কতকটা ইহা হইতেও বটে, আর কতকটা

পদ্মাবতীর সুখচিন্তায় লিপ্ত থাকায়, বিজয়চাঁদ দু'চারি দিন চারি দিকে ততটা নজর রাখিতে পারিলেন না। সেই অবসরে আবার নয়নচাঁদের শরীরে বিষ প্রবিষ্ট হইল। এবারের বিষ বড় সাংঘাতিক বিষ!

এই গুপ্ত আততায়ী যেই হউক্, সে বুঝিয়াছিল যে, যখন বিষের কথাই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, তখন আর সেই গুপ্তক্রিয়াকারী দীর্ঘকালসাপেক্ষফল প্রচ্ছন্নগতি বিষের দরকার কি? যাহাতে এক দিনে দুই দিনেই কার্য্যোদ্ধার হয়, এখন সেইরূপ উৎকট বিষ দেওয়াই ভাল। কাজেই এইবার বিশেষ উৎকট বিষের ব্যবস্থা হইল। নয়নচাঁদ বিছানায় পড়িয়া এ পাশ ও পাশ করিতে লাগিলেন।

পদ্মাবতী পূর্ব্বোক্ত পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার পরে কতকদিন আর বাহির হয় নাই। আজ নয়নচাঁদের পীড়াবৃদ্ধির সংবাদ শুনিয়া দেখিতে আসিল। তাহার দেহ শীর্ণ, মুখমণ্ডল ম্লান হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সেদিকে তখন কাহারও দৃষ্টিপাত করিবার সময় নাই। পদ্মা তন্ন তন্ন করিয়া রোগীর দেহ পরীক্ষা করিল। পরীক্ষা করিয়া বুঝিল,—এবার শ্রেষ্ঠীর জীবন বাস্তবিকই সঙ্কটাপন্ন—আশা অতি কম। পদ্মা অনেক ভাবনা-চিন্তা করিয়া কতকগুলি ভাল ভাল ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া দিয়া বাড়ী ফিরিল।

পথে আসিতে আসিতে পদ্মা ও শ্যামলী একটা আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিল। দেখিল, একটা বৃক্ষতলে বসিয়া সেই নীরব রাত্রিতে নির্জ্জন পথের ধারে একটা লোক কাঁদিতেছে। পদ্মা কহিল,—

"শ্যামলি, অত রাত্রে পথের ধারে পড়িয়া লোকটা কাঁদিতেছে, ব্যাপার কি? অবশ্য ইহাতে একটা বিশেষ কথা থাকিবে। চল্, জিজ্ঞাসা করিয়া আসি।"

শ্যামলী বলিল, "চল"।

তখন উভয়ে সেই খানে যাইয়া উপস্থিত হইল। লোক-টার বয়স ঠিক অনুমান হইতেছিল না—পঁয়ত্রিশ কি চল্লিশ বৎসর। বড় দীনহীন বেশ—বড় দরিদ্র!

পদ্মাবতী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে গো? কাঁদ কেন?" লোকটা একবার চাহিয়া তাহাদিগকে দেখিল। তার পর আবার অনুচ্চস্বরে কাঁদিতে লাগিল; উত্তর করিল না।

প। তোমার কি আজ আহার জোটে নাই—ক্ষুধায় যাতনা পাইতেছ? আমাকে বল, আমি তোমার সাহায্য করিব।

এবার সেই ক্রন্দনকারী উত্তর করিল। কহিল, "না মা, আমার নিজের ভাবনা আমায় কাতর করে নাই। আমার একটী প্রাণের পুত্তলি আজ আমায় ছাড়িয়া যাইতেছে, সেই দুঃখে কাঁদিতেছি।"

পদ্মা কিছু বুঝিতে পারিল না। কহিল, "কিছু বুঝিতে পারি-লাম না। সকল কথা ভাঙ্গিয়া বল—আমি তোমাকে সাহায্য করিব।"

তখন সেই দীনহীন দরিদ্র পুরুষ চক্ষু মুছিয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে কহিল, "মা, সে কথা বলিয়া কি হইবে? আগার দুঃখ তুমি কখনও দূর করিতে পারিবে না—এ কার্য্য মেয়ে লোকের নয়। আমার একটী ছোট মেয়ে আজ মৃত্যুশয্যায় শায়িত। এতক্ষণ বাঁচিয়া আছে, কি মরিয়াছে, জানি না। চিকিৎসক খুঁজিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু অদৃষ্টদোষে চিকিৎসক মিলিল না। দরিদ্রকে বিনা পয়সায় কেহ সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইল না। মা, তুমি এই নগরবাসিনী বলিয়া বোধ হইতেছে। যদি তোমার জানা

শোনা এমন কেহ দরিদ্রের সহায় চিকিৎসক থাকেন, তবে আমায় কেবল মাত্র সেই কথাটীই বলিয়া দাও, আমার মহৎ উপকার হইবে।"

প। তোমার ঘর কতদূর?

পুরুষ। প্রায় দেড় ক্রোশ।

পদ্মা শ্যামলীর মুখের দিকে চাহিল। শ্যামলী কহিল, "আর রাত্রি নাই যে।"

প। এক ক্রোশ পথ আসিতে যাইতে রাত্রি একেবারে ভোর হইয়া যাইবে না। চল্ দেখিয়া আসি।

শ্যা। তোমার খুসী। চল।

তখন পদ্মাবতী সেই লোকটাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "তুমি পথ দেখাইয়া চল, আমি চিকিৎসা-বিদ্যা অবগত আছি, আমিই তোমার কন্যাকে দেখিতে যাইব।"

লোকটা ফ্যাল ফ্যাল করিয়া পদ্মার দিকে কতক্ষণ চাহিয়া রহিল। তাহা দেখিয়া পদ্মা কহিল, "কি দেখিতেছ? বিশ্বাস করিতেছ না কি? আমি বেণীপ্রসাদের দুহিতা! পিতার নিকট চিকিৎসা-বিদ্যা পাঁচ বৎসর শিক্ষা করিয়াছি। এইমাত্র আর একটী রোগী দেখিয়া আসিলাম; দেখিতেছ না, উহার হস্তে ঔষধের পুটলী!"

পদ্মাবতী শ্যামলীর হস্তস্থিত ঔষধের পুটলী দেখাইয়া দিল।

তখন সেই ব্যক্তি যেন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কহিল, "তবে এস মা এস, আমার সঙ্গে এস, বিধাতা আমার প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন, দেখিতেছি। শীঘ্র এস।"

লোকটা অগ্রে অগ্রে দ্রুত যাইতে লাগিল। পদ্মা ও শ্যামলী

পিছনে পিছনে ছুটিল। তাহারা নগর ছাড়িয়া গ্রামে পড়িল, গ্রাম ছাড়িয়া মাঠে ঢুকিল, মাঠ পার হইয়া অবশেষে নদীতটে উপনীত হইল।

নদশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মপুত্র তখন মৃদুমন্দ তরঙ্গে নাচিতেছে। তাহার অনন্তবিস্তার বক্ষে নানাদেশীয় পোতরাজি এক একটা নিদ্রিত ভীষণ জলজন্তুর মত শোভা পাইতেছে। সেকালে সুবর্ণ-গ্রামের বন্দরে সুদূর চীন, জাপান, সিংহল ও যবদ্বীপ হইতেও পণ্যাদি সরবরাহ করা হইত। হায়, হিন্দুর সে দিন আজ কোথায় গেল? কোথায় গেল বাঙ্গালীর সে শৌর্য্য, বীর্য্য, ঐশ্বর্য্য? কোথায় গেল সেই অতীত গৌরব, সম্পদ? আজ আমরা কাপুরুষ, পরমুখাপেক্ষী, অর্দ্ধাশনক্লিষ্ট। কিন্তু চির-কালই কি এমনি ছিল? যখন দেশে হিন্দু রাজা ছিল, তখন হিন্দুর শৌর্য্য বীর্য্য কে দেখিত? যখন দেশ বাঙ্গালীর ছিল, তখন বাঙ্গালীর ঐশ্বর্য্য কে গণনা করিত? যখন নানাদেশীয় পোতরাজি নানা দেশ হইতে নানাজাতীয় পণ্য বহন করিয়া এই সুদূরবিশ্রান্ত অম্বুরাশির উপর বিচরণ করিত, তখন বাঙ্গালীর অন্ন কে খাইত? তখন পরপদলেহনবৃত্তি বাঙ্গালীর হৃদয়ে ছিল না; তখন লাথি মারিলে বাঙ্গালী নিঃশব্দে নির্ব্বিকার মানবের মত তাহা হজম করিতে জানিত না; তখন কাণ মলিলে সে তিন হস্ত দূরে দাঁড়াইয়া, তিনবার সেলাম ঠুকিতে ঠুকিতে "হাম্ আপ্‌কো তাবেদার হ্যায়", বার বার একথা জানাইতে ব্যস্ত হইত না। তখন ঘরের মধ্যে সিংহমূর্ত্তি, আর বাহিরে মার্জ্জারা-বতার এ জাল-জোয়াচুরির এ দেশে বিশেষ অভাব ছিল। হায়, কোথায় গেল সে কাল?

ঘাটের পাশে একখানা ক্ষুদ্র নৌকা লাগিয়া ছিল। পদ্মার ও শ্যামলীর পথ-প্রদর্শক যাইয়া সেই নৌকায় উঠিল। কহিল, "উঠ মা, ও পারে যাইতে হইবে। আমার ঘর ও পারে।"

পদ্মা ও শ্যামলী কতক্ষণ ইতস্ততঃ করিল। তাহা দেখিয়া সেই ব্যক্তি কহিল, "মা দেরি করিলে চলিবে না—দেরি করিও না। বিলম্বে বিপদ ঘটিতে পারে।"

ভাবিবার সময় নাই—পদ্মা যাইয়া নৌকায় উঠিল। পদ্মা দেখিল, সেই নৌকায় আর একজন স্ত্রীলোক বসিয়া। নৌকা খানা ক্ষুদ্র; মাস্তলের উপর পাল খাটান ছিল। পালের দড়ি সেই ব্যক্তির হাতে। শ্যামলীও নৌকায় উঠিতে গেল। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল। অকস্মাৎ সেই ব্যক্তি জোরে পালের দড়ি ধরিয়া টানিল। হঠাৎ বাতাস আবদ্ধ হইয়া পালে জোর করিল। নৌকাখানা সাঁ করিয়া ঘুরিয়া তীর হইতে এক পাকে প্রায় নদীর মধ্যে যাইয়া পড়িল। আর শ্যামলী সেই আঘাতে অচৈতন্য হইয়া তীরে পড়িয়া গেল। নৌকা মধ্যে যাইয়া, তীরবেগে জলরাশি অতিক্রম করিয়া যাইতে লাগিল। পদ্মা চীৎকার করিয়া কহিল, "কি করিলে, কি করিলে, শীঘ্র নৌকা তীরে লাগাও।" কিন্তু সে ব্যক্তি তাহার কথার যে উত্তর দিল, তাহাতে তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। সে কহিল, "চুপ কর, চেঁচাইও না; তুমি এখন আমার বন্দী।" তখন পদ্মা সকল ব্যাপার বুঝিতে পারিল। বুঝিল যে, সে কোন দুরাচারের প্রলোভনে পতিত হইয়াছে। পদ্মা হঠাৎ জলে লাফাইয়া পড়িতে গেল। কিন্তু নৌকাবাহী ব্যক্তি এজন্য প্রস্তুত ছিল। সে এতক্ষণ পালের দড়ি নৌকার কাঠে ভাল করিয়া বাঁধিয়াছে। এখন হঠাৎ আসিয়া পদ্মাকে ধরিয়া উক্ত স্ত্রীলোকের

সাহায্যে হস্তপদে বন্ধন করিল। তারপর কহিল, "যদি মঙ্গল চাও, এই ভাবে থাক। কেহ তোমার উপর কিছু অত্যাচার করিবে না, তোমার কিছু আশঙ্কা নাই। কিন্তু যদি পলাইতে চেষ্টা কর, বিপদ ঘটিতে পারে। তোমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইয়াছে। অচিরাৎ তুমি বড়মানুষ হইবে।"

পদ্মা আর উচ্চবাচ্য করিল না—করিবার ক্ষমতাও ছিল না। নৌকা সাঁ সাঁ করিয়া নানা দেশ অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিল। পদ্মা সেই ভাবে পড়িয়া রহিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—*—

অদ্ভুত সমস্যা।

দেখিল সুন্দররূপ নর একজন।

হেমচন্দ্র।

শ্যামলী কতক্ষণ সেই ভাবে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা ঠিক বুঝিতে পারিল না। কিন্তু যখন তাহার চৈতন্য হইল, তখন চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সে বড়ই বিস্মিত হইল। সে দেখিল, সেই কল-কল-নাদী তরঙ্গভঙ্গসংক্ষুব্ধ বিশালোরস ব্রহ্মপুত্রের বালুকাময় সৈকতের পরিবর্ত্তে সে একটী সুন্দর সুসজ্জিত কক্ষে শায়িত আছে। প্রভাত হইয়াছে। চারিদিকে বিহঙ্গমগণ আনন্দধ্বনি করিতেছে, আর সূর্য্যকিরণ গবাক্ষপথে

প্রবিষ্ট হইয়া কক্ষটিকে হাসাইয়া তুলিয়াছে। শ্যামলী আরও দেখিল, তাহার শয্যাপার্শ্বে শিরোভাগে বসিয়া একজন পুরুষ! শরীর বিশেষ দুর্ব্বল থাকায়, শ্যামলী মাথা উচু করিয়া তাহাকে ভালরূপ দেখিতে পারিল না। কিন্তু ভাবে বুঝিল, সে পুরুষ রূপবান্ ও ঐশ্বর্য্যশালী। শ্যামলীর পূর্ব্ব-রাত্রির কথা ক্রমে ক্রমে স্মরণ হইল। স্মরণ হওয়া মাত্র পদ্মাবতীর চিন্তায় তাহার প্রাণ বড় অস্থির হইয়া পড়িল। সে আর কালবিলম্ব করিতে পারিল না ;—একবার সকল শক্তি সঞ্চয় করিয়া সেই অপরিচিত পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কে ?"

শ্যামলীকে কথা কহিতে দেখিয়া শিরোদেশোপবিষ্ট পুরুষ সম্মুখে আসিয়া বসিল। তখন শ্যামলী তাহাকে ভাল করিয়া দেখিতে পাইল। দেখিয়া তাহার আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। বিস্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভয়েরও সঞ্চার হইল। শ্যামলী দেখিল, এ সেই নিশীথ-দৃষ্ট ফকির—সেই পদ্মাবতীর প্রেমাকাঙ্ক্ষী পুরুষ! ইহাকেই তাহারা একদিন তাহাদিগকে অনুসরণ করিতে দেখিয়াছিল ; এ যুবকই তৎপরে বেণীপ্রসাদের আলয়ে পদ্মাবতীর পাণিগ্রহণ করিতে গিয়াছিল। তবে কি এই কুলাঙ্গারই পদ্মাবতীকে লাভ করিবার জন্য এই প্রতারণা করিয়াছে? শ্যামলী ভালরূপ লক্ষ্য করিতে লাগিল, এ পুরুষের সঙ্গে কল্যকার নিশীথে দৃষ্ট প্রতারকের কোনরূপ সাদৃশ্য আছে কি না। কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়াও সেরূপ কিছু দেখিতে পাইল না। কিন্তু তবু তাহার নিশ্চিত প্রতীতি হইল, এ ইহারই কার্য্য, ইহারই প্ররোচনায় অন্যলোকে পদ্মাবতীকে হস্তগত করিয়া থাকিবে। শ্যামলী আরও অনুমান করিল—বুঝিল, এ ব্যক্তি যেই হউক, নানা সময়ে নানা ছদ্মবেশ

ধারণ করিয়া থাকে। প্রথম যে দিন সে তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিল, সে দিন তাহার মুসলমান ফকিরের বেশ ছিল, আজিও বেশ প্রায় তদ্রূপ, কিন্তু চেহারাটায় একটু গোলযোগ হইয়াছে। চেহারাটা আজ অনেকটা হিন্দুর মত হইয়াছে। শ্যামলী পদ্মাবতীর নিকট শুনিয়াছিল, যে দিন এই ব্যক্তি বেণীপ্রসাদের আলয়ে গিয়াছিল, সে দিনও তাহার এই হিন্দু যোদ্ধার বেশই ছিল। এ ব্যক্তি যে একজন বিশেষ ছদ্মবেশী পুরুষ, শ্যামলীর সে বিষয়ে আর সন্দেহ মাত্র রহিল না।

সেই পুরুষ অনেকক্ষণ শ্যামলীর দিকে চাহিয়া রহিল। শ্যামলীকে এইরূপ চিন্তিত ও বিস্মিত হইতে দেখিয়া একটু হাসিল। তার পর কহিল,—

"আমাকে কি তুমি চিনিতে পারিতেছ না?"

শ্যা। না।

পু। মেয়ে লোকের দৃষ্টিশক্তি এত ক্ষীণ, তাহা জানিতাম না। তোমার ঠাকুরাণী আমাকে একদৃষ্টে চিনিয়াছিল।

শ্যা। ঠাকুরাণী যতটুকু চিনিয়াছিলেন, আমিও ততটুকু চিনিতে পারিতেছি। কিন্তু এ কখনও আপনার স্বরূপ নহে, আপনার আসল পরিচয় আমরা কিছু অবগত হইতে পারি কি?

পু। আমার নাম রাজারাম। ইহার অধিক আর কিছু পরিচয় এখন পাইবে না।

শ্যা। আপনি রাজারাম হউন, আর যেই হউন, আমার ঠাকুরাণী নিশ্চিত আপনার অনুরাগিণী নহেন। আপনি তাঁহাকে বন্দী করিলেন কেন?

রাজারাম বিস্মিতভাব ধারণ করিলেন। কহিলেন,—

"তুমি কি কহিতেছ?"

শ্যা। আপনি আমার ঠাকুরাণীকে কাল রাত্রিতে প্রতারণা করিয়া আবদ্ধ করিয়াছেন। কেন এরূপ করিলেন?

রা। পদ্মাবতীকে?

শ্যা। কেন, সে কথা কি আপনি অবগত নহেন?

রা। কখনই না। আমি এই কথা এই মাত্র শুনিলাম।

শ্যা। আপনি বিশেষ ভয়ঙ্কর লোক দেখিতেছি। কিন্তু মনে করিবেন না, পাপ করিয়া বল্লালের রাজ্যে কদাপি পরিত্রাণ পাইবেন।

রাজারাম হাসিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "ভাল, ভাল, এ তুমি উত্তম কথা কহিলে, তুমি বিশেষ রাজভক্ত দেখিতেছি,—এ উত্তম কথা। কিন্তু আমিও রাজদ্রোহী নই। আমি স্বরূপ কহিতেছি শোন, আমি পাপ করিয়া থাকি, স্বয়ং তোমার সঙ্গে যাইয়া বল্লালের নিকট শাস্তিগ্রহণ করিব, এখন কল্যকার ঘটনাটী আমাকে বিস্তারিত ভাঙ্গিয়া বল। দেখি কিছু করিতে পারি কি না।"

শ্যা। রাজারাম, ছলনা পরিত্যাগ কর।

রা। মূর্খে, নির্ব্বুদ্ধিতার বশবর্ত্তী হইয়া সকল নষ্ট করিও না। আমি দেবতা সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, এ তত্ত্ব আমি কিছুই অবগত নহি। পদ্মাবতীকে হস্তগত করিবার ইচ্ছা থাকিলে, আমি কখনই স্বেচ্ছায় তাহাকে সে দিন পরিত্যাগ করিয়া আসিতাম না। আমি যে হই, পদ্মাবতীর বিশেষ হিতাকাঙ্ক্ষী জানিবে।

শ্যামলী দেখিল, এ কথা যুক্তিযুক্ত বটে। যে স্বেচ্ছায় সে দিন পদ্মাবতীকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, সে আজ বলপ্রয়োগে কেন তাহাকে গ্রহণ করিতে যাইবে? শ্যামলী কহিল,—

"তবে এ কাজ কে করিল? আমাকেই বা এখানে কে আনিল!"

রা। এ কাজ কে করিয়াছে, ব্যাপার না জানিলে তাহা কিরূপে অনুমান করিব? কিন্তু তোমাকে এখানে আমি স্বয়ং আনিয়াছি। স্রোতস্বতীকূলে অর্দ্ধবালুকারাশিবিমণ্ডিতা সংজ্ঞারহিতা রমণী-মূর্ত্তি দেখিয়া স্বালয়ে আনিয়া স্থান দিয়াছি। ইহাতে যদি অপরাধ করিয়াছি, মনে কর, তবে বল আবার যাইয়া সেই নদী-সৈকতেই ফেলিয়া আসি। রমণী এমনিই অকৃতজ্ঞ বটে!

তিরস্কৃত হইয়া শ্যামলী অধোবদন হইল। কহিল,—

"তবে, বলুন আপনি কে?"

রা। বলিয়াছি ত, এখন আর অধিক কিছু পরিচয় পাইবে না। নানা গুরুতর কার্য্যে আমাকে অনেক সময় ছদ্মবেশে নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে হয়। কিন্তু রমণীর নিকট সে সব বৃত্তান্ত বর্ণনীয় নহে। এখন মঙ্গল চাও ত, তোমার বৃত্তান্ত বল। বিলম্বে পদ্মাবতীর উদ্ধারের পথ রুদ্ধ হইতে পারে।

রাজারামের বাক্যপ্রণালী বড় গম্ভীর; আকার, ইঙ্গিত, হাব, ভাব বড় উন্নত! শ্যামলী তাহাকে বিশ্বাস করিবে কি না করিবে, ঠিক বুঝিতে পারিল না। কিছু বিশ্বাসে, কিছু অবিশ্বাসে, একে একে সকল ঘটনা বর্ণনা করিল। কিছুই গোপন করিল না। শেষটা বলিল, "আমি সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিলাম, কিছু গোপন করিলাম না,—এখন আপনাকে একটা কাজ করিতে হইবে। আমি আর আমার প্রভুর আলয়ে ফিরিতে পারিব না। পদ্মাবতীর হরণ-বৃত্তান্ত শুনিলে তিনি আর আমাকে আস্ত রাখিবেন না। কারণ আমিই তাহার সকল কার্য্যের সহায়। এখন আপনাকেই আমায় আশ্রয় দিতে হইবে। আপনি দয়া করিয়া ঠাকুরাণীর অনুসন্ধান করুন, আর যতদিন না তাঁহার খবর হয়, ততদিন আপনার আলয়ে

থাকিবার মত আমাকে অনুমতি দিন্। আর প্রতিজ্ঞা করুন, বেণী-প্রসাদকে আমার বিষয় কখনও কোন কথা জানিতে দিবেন না।"

রাজারাম কতক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করিয়া সে কথা ভাবিলেন। তার পর কহিলেন, "ভাল, তাহাই হইবে। তুমি যতদিন খুসী এই খানেই থাক। কেহ তোমায় বাধা দিবে না।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অদৃষ্টের পরিহাস!

His wrath was changed to wailing.

T. Cambell.

নয়নচাঁদ বাঁচিল না। পদ্মাবতী দস্যুকরে বন্দিনী, ঔষধ দেয় কে? পদ্মার অন্তর্ধানের দুই দিন পরেই তাঁহার সব শেষ হইয়া গেল।

মরিবার পূর্ব্বে নয়নচাঁদ বিজয়চাঁদকে সস্নেহে নিকটে আহ্বান করিলেন। মুমূর্ষু পিতার বক্ষের নিকটে বসিয়া পান্না আকুল-হৃদয়ে ক্রন্দন করিতেছিল। নয়নচাঁদ বিজয়ের হস্তে তাহার হস্ত সঁপিয়া দিয়া কহিলেন, "বৎস, আমি চলিলাম, ইহাকে দেখিও। ভগিনীকে চিরকাল আদর যত্ন করিও, এবং সৎপাত্রে অর্পণ করিও। আর এই কৌটাটী ধর; (নয়নচাঁদ শয্যাতল হইতে গজদন্ত-নির্ম্মিত একটী মনোহর ক্ষুদ্র কৌটা বাহির করিয়া বিজয়ের হস্তে দিলেন) ইহাতে যাহা রহিয়াছে, তাহা তোমার। কিন্তু

দেখিও, সম্বৎসরের ভিতর এ কৌটা খুলিও না। চাবি বন্ধ আছে। বৎসরান্তে খুলিয়া যাহা পাও, গ্রহণ করিও। তৎপূর্ব্বে খুলিলে অমঙ্গল ঘটিতে পারে।”

বিজয়চাঁদ সজলনয়নে কৌটাটী উপরে তুলিয়া রাখিলেন। বৃদ্ধের এই অদ্ভুত কথায় তখন বিস্মিত হইবার সময় ছিল না। কথা কয়টীর পরিসমাপ্তির কিয়ৎকাল পরেই তাঁহার অস্তিত্ব পঞ্চভূতে মিশিয়া গেল।

ইহার পর দিন বিজয়চাঁদ স্ব-কক্ষে বসিয়া আছেন, প্রভাতের তরুণ কিরণমালা গবাক্ষপথে গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া চারিদিকে হৈম-কান্তি ছড়াইয়া দিতেছে, বাহিরে উদ্যানের বৃক্ষশিরে বসিয়া পক্ষিগণ আনন্দে কোলাহল করিতেছে—মৃদুমন্দ সমীরণ চুপে চুপে বাগানের পুষ্পরাশি হইতে সৌরভ হরণ করিয়া ইতস্ততঃ ছুটিয়া পলাইতেছে; আর—সে সকল অনুভব করিয়া পিতৃহীন যুবকের বিষাদকালিমা-মণ্ডিত নয়নযুগল বাষ্পার্দ্রভাব ধারণ করিতেছে—এমন সময় সে স্থানে দ্রুতপদবিক্ষেপে একজন লোক আসিয়া দাঁড়াইল। বিজয়-চাঁদ বিস্মিত হইয়া দেখিলেন—সে বেণীপ্রসাদ!

বেণীপ্রসাদের রুক্ষ কেশ, ছিন্ন বেশ, সর্ব্বাঙ্গে উচ্ছৃঙ্খলতা। বিজয়চাঁদ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না; কিন্তু বুঝিতে বেশী বিলম্বও হইল না। বেণীপ্রসাদ দাঁড়াইয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন,—

“বিজয়চাঁদ, আমার পদ্মাবতী কোথা?”

বিজয় আরও বিস্মিত হইলেন। কহিলেন “পদ্মাবতী! কৈ পদ্মাবতী তো আজ এখানে আইসে নাই।”

বেণী। আজ আসিবে কেন? আজ দু’দিন হয় আসিয়াছে। শীঘ্র বল তাহাকে কোথায় রাখিয়াছ?

বি। আমি কোথায় রাখিয়াছি! আপনি কি কহিতেছেন? পদ্মাবতী কি দু'দিন যাবৎ ঘরে নাই?

বেণী। কপটতা ছাড়। যদি নিজের মঙ্গল চাও, পিতৃপুরুষের সদ্গতি প্রার্থনা কর, তবে পদ্মাকে ছাড়িয়া দাও—নতুবা স্বরূপ কহিতেছি জানিও, বিশেষ অমঙ্গল ঘটিবে।

বি। মহাশয়, আমিও স্বরূপ কহিতেছি শুনুন, আমি এ বিষয়ের কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। অনুভবে বুঝিতেছি, পদ্মাবতী নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছে। কি হইয়াছে, শীঘ্র ভাঙ্গিয়া বলুন—আমার বিশেষ আশঙ্কা হইতেছে।

বেণীপ্রসাদ স্থির-গম্ভীর-দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। বিজয় কহিলেন, "আপনি কি আমায় বিশ্বাস করিতেছেন না?"

বেণী। কি করিয়া বিশ্বাস করিব? তবে কে পদ্মাবতীকে হরণ করিল? বিজয়চাঁদ, আমার সংসারের একমাত্র বন্ধন পদ্মাবতী;—সত্য কহ, তুমি তাহার খবর অবগত কি না?

বি। সত্য কহিতেছি, আজ দু'দিন যাবৎ আমি তাহার কোনও খবরই অবগত নহি।

বেণীপ্রসাদ তখন হঠাৎ উন্মত্তের মত চীৎকার করিয়া উঠিলেন। "হায়, হায়, দেখিতেছি সব চেষ্টাই বৃথা হইল। আর কোথায় যাইব? আর কোথায় অনুসন্ধান করিব? এই দুই দিনে আমি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড উলটপালট করিয়াছি—তবু সন্ধান মিলিল না। একি অদৃষ্টের উপহাস?" বেণীপ্রসাদ করে কর মর্দ্দন করিয়া চঞ্চল-দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। তাঁহার এই ভাব দর্শন করিয়া বিজয়চাঁদ কহিলেন,—

"মহাশয় ব্যস্ত হইবেন না, ব্যস্ত হইলেই কার্য্যসিদ্ধি হয় না।

এখন, কি ঘটিয়াছে আমায় সবিশেষ ভাঙ্গিয়া বলুন। আপনার সহিত একদিন আমাদের শত্রুতা ছিল, কিন্তু এখন আমি সে কথা বিস্মৃত হইয়াছি। পদ্মা যাঁহার দুহিতা, তিনি আমার শত্রু নহেন —তিনি আমার—”

বিজয়চাঁদের কথা সমাপ্ত হইতে না হইতেই বেণীপ্রসাদ আবার চীৎকার করিয়া উঠিলেন। হঠাৎ বাধা দিয়া কহিলেন,—“বিজয়-চাঁদ, বিজয়চাঁদ, ক্ষান্ত হও। আকাশে স্বুবর্ণকুটীর রচনা করিও না, বৃথা আশায় মুগ্ধ হইও না। তোমার আশা ভরসা মিথ্যা, একেবারে মিথ্যা—স্বপ্ন হইতেও ক্ষণভঙ্গুর! পদ্মাবতী তোমার হইবে? হা ছলনা! হা অদৃষ্টের উপহাস!”

বিজয়চাঁদ বিমর্ষ হইলেন। নতজানু হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, “বৈদ্যরাজ, ক্রোধ পরিত্যাগ করুন; আমার সর্ব্বস্ব গ্রহণ করুন। আমি মান, অপমান, অভিমান, সকল আপনার চরণে অর্পিত করিলাম – আমাকে পদ্মাবতী-ভিক্ষা দিন্। আজ্ঞা করুন, সসাগরা পৃথিবী অনুসন্ধান করিয়া আমি পদ্মাবতী-হার কণ্ঠে ধারণ করি।”

বেণী। অসম্ভব! অসম্ভব!

বি। এক দিনের অপরাধেরও কি ক্ষমা নাই, বৈদ্যরাজ?

বে। অপরাধ! ক্ষমা! কার অপরাধ, বিজয়চাঁদ?

বি। আমারই অপরাধ। আর কার? নয়নচাঁদের অপরাধ কি তা আমি জানি না, জানিতে চাহি না।

বে। বিজয়চাঁদ, ভুল! ভুল! সকলই ভুল! আজ একটা নূতন কথা কহি শোন—অপরাধ তোমার নহে, নয়নচাঁদেরও নহে—অপরাধ আমার! আমার অপরাধের ক্ষমা নাই, দেখিতেছি।

বিজয়চাঁদ বেণীপ্রসাদের দিকে বিস্মিতভাবে চাহিয়া রহিলেন।

বেণীপ্রসাদ আবার কহিলেন, "শোন বিজয়চাঁদ, আজ তোমায় একটা অদ্ভুত গল্প শোনাইব। কিন্তু সে গল্প শুনিবার আগে লৌহকবচে তোমার হৃদয় আবৃত কর। আমি যে অপূর্ব্ব কাহিনী কহিব, তাহাতে তোমার হৃদয় চূর্ণীকৃত হইবে, আশা ভরসা নির্ম্মূল হইবে, তোমার স্বপনের ছবি আকাশে মিলাইয়া যাইবে, কিন্তু তবু সে কথা আজ তোমায় জানিতে হইবে। মনে করিয়াছিলাম, এ জন্মে এ কথা পৃথিবীর কাহাকেও জানিতে দিব না; কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা সেরূপ নহে, স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি। মঙ্গলময় আমাকে চিরাভিশাপগ্রস্ত করিয়া পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন—সে বিধানের বিপরীত সাধন করিতে গিয়া আমি যথেষ্ট শিক্ষা পাইয়াছি; আমার সমস্ত অহঙ্কার চূর্ণিত হইয়াছে। বিজয়চাঁদ, আজ আমাকে সে কাহিনী নিজ মুখেই তোমার নিকট খুলিয়া বলিতে হইবে—শ্রবণ কর।"

বেণীপ্রসাদ এতক্ষণ পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়াই ছিলেন। এই কথা কহিয়া অযাচিত ভাবেই নিকটস্থ একটী আসনে উপবেশন করিলেন। তার পর ক্ষণকাল কি চিন্তা করিয়া গল্প আরম্ভ করিলেন।

বেণীপ্রসাদ কহিলেন,—"তুমি জান, নয়নচাঁদ আমার পরম শত্রু; কিন্তু চিরকালই এইরূপ ছিল না। বিজয়চাঁদ, ছোটকালে আমাদের ভিতর গাঢ় বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। আমরা উভয়ে নবদ্বীপের সন্নিকটে একই আলয়ে বাস করিতাম। উভয়ে একই মঠে পাঠ করিতাম, একই গুরুর শিষ্য ছিলাম, একই শাস্ত্র উভয়কে অধ্যয়ন করিতে হইত। একজনকে না জিজ্ঞাসা করিয়া অপরে কখনও স্নানাহার করিতাম না। একজনকে না জানাইয়া অপরে কোনও

কার্য্যে হাত দিতাম না। এইরূপ সৌহার্দ্দে আমাদের বাল্যকাল অতিবাহিত হইতেছিল। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা মনুষ্যে বুঝিতে পারে না। আমাদের এ ভাব অধিকদিন রহিল না—এ প্রণয়াকাশে শীঘ্রই মেঘ দেখা দিল।”

বেণীপ্রসাদ এই পর্য্যন্ত বলিয়া কতক্ষণ থামিলেন। তারপর আবার বলিতে লাগিলেন,—“যৌবনের প্রারম্ভে একদিন আমি কোন এক বিধবার সুন্দরী কন্যাকে দেখিয়া মোহিত হইলাম। বিধবার অপর কেহ ছিল না, সুতরাং তাহার কন্যাকে লাভ করা আমার নিকট বিশেষ দুর্ল্লভ বলিয়া মনে হইল না। মিলনের সম্ভাবনা আমার অনুরাগ-বহ্নিতে দিন দিন ফুৎকার দিতে লাগিল। আমি অবশেষে বন্ধুকে সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিলাম।

“নয়নচাঁদ সকল শুনিয়া প্রথমতঃ হাসিল। তার পর বিধবার নিকট আমার জন্য কন্যা প্রার্থনা করিতে স্বীকৃত হইল। কিন্তু রমণীর সৌন্দর্য্যের অসাধ্য জগতে নাই। নয়নচাঁদ প্রস্তাব করিতে যাইয়া, আমার কথা কহিবে কি ? বালিকার রূপলাবণ্যে নিজেই মুগ্ধ হইয়া গেল! সেই দিন হইতে নয়নচাঁদে ও আমাতে বৈরিভাব স্থাপিত হইল।”

বেণীপ্রসাদ আবার একটু থামিলেন। বিজয়চাঁদ এই অদ্ভুত কাহিনী নীরবে শুনিতেছিলেন, সেইরূপ নীরব রহিলেন। ভিষক্ আবার আরম্ভ করিলেন,—

“নয়নচাঁদের সৌন্দর্য্য আমা অপেক্ষা অধিক ছিল, সুতরাং আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাহারই জয় হইল। বালিকা ও বালিকার মাতা উভয়ে নয়নচাঁদকেই মনোনীত করিলেন। তার পর একদিন গোপনে তাহাদের বিবাহ হইয়া গেল। রাগে, দুঃখে

ও অভিমানে আমি নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া সুবর্ণগ্রামে আসিয়া বাস করিতে লাগিলাম।

“ইহার পর কতক কাল কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে আমাদের আর দেখা-সাক্ষাৎ হইল না। আমিও আর বিবাহের নাম মাত্র করিলাম না। কিন্তু পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পরে নয়নচাঁদ হঠাৎ আবার আসিয়া সুবর্ণগ্রামে দেখা দিল। নয়নচাঁদ এত দিনে অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিল। সুতরাং রাজা তাঁহাকে বহু সম্মানপূর্ব্বক রাজকর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। সে সময় তাঁহার সঙ্গে তাঁহার স্ত্রীও আসিয়াছিল। ইতিমধ্যে তাঁহাদের একটী পুত্র জন্মিয়াছিল ; তাহার বয়স তখন চার পাঁচ বৎসর। সেও সঙ্গে আসিল। বিজয়চাঁদ, সে পুত্র আর কেহ নহে, সে পুত্র তুমি !”

বেণীপ্রসাদ আবার থামিয়া বিজয়চাঁদের দিকে এক তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। বিজয়চাঁদ—স্থির, ধীর, অবাক্ ! বেণীপ্রসাদ পুনঃ আরম্ভ করিলেন,—

“এতদ্ব্যতীত নয়নচাঁদ-পত্নী তখন অন্তঃসত্ত্বা। বিজয়চাঁদ, আমি লুকাইয়া লুকাইয়া সেই অবস্থায় প্রত্যহ আসিয়া তাহাকে দূর হইতে দর্শন করিতে লাগিলাম। একটীবার তাহার দর্শন পাইবার জন্য আহার নিদ্রা ভুলিয়া যাইয়া, বৃক্ষশিরে পত্ররাশির ভিতর আপনাকে লুক্কায়িত করিয়া রাখিতাম। আর একবারমাত্র সফলমনোরথ হইলেই কৃতার্থ হইয়া ঘরে ফিরিতাম। কিন্তু বিজয়চাঁদ, আমার এ সুখ বেশী দিন স্থায়ী হইল না। প্রসবের সঙ্গে সঙ্গেই তোমার জননী ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

“তোমার জননী ফুটন্ত মল্লিকার মত দুইটী কন্যাসন্তান প্রসব করিয়া গিয়াছিলেন। দুইটীই দেখিতে খুব সুশ্রী হইয়াছিল, কিন্তু

একটী ঠিক তাহার মাতার অনুরূপাকৃতি লাভ করিল। বিজয়-চাঁদ, জননীর আকৃতি কন্যাতে দেখিতে পাইয়া আমি সেই ক্ষুদ্র শিশুটীর প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া পড়িলাম। নয়নচাঁদ-পত্নী প্রাণ-ত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু আমার তথায় যাতায়াত ঘুচিল না। মাতৃ-ছবিপ্রাপ্তা কন্যাকে দেখিবার জন্য আমি পুনঃ পুনঃ সেইরূপ আসিতে যাইতে লাগিলাম। কিন্তু ইহাতেও ঈশ্বর বাদী হইলেন, একদিন সেই ক্ষুদ্র শিশুটীও অসুস্থ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল।

"সেই সময়ে সুবর্ণগ্রামে চিকিৎসা-ব্যবসায়ে আমার বিশেষ প্রতিপত্তি। সে কথা নয়নচাঁদও জানিতেন, কিন্তু অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি আমায় ডাকিলেন না। অযাচিত ভাবে আমিও আসিয়া শিশুটীকে উদ্ধার করিবার পথ পাইলাম না। তখন মনে মনে একটা অদ্ভুত বুদ্ধি স্থির করিলাম।

"রাত্রিতে লোকে শিশুটীকে মাটি দিতে শ্মশানে লইয়া গেল, আমি পিছু পিছু গেলাম। তাহারা তাহাকে সমাধিস্থ করিয়া চলিয়া গেলে, আমি সেই রজনীর অন্ধকারে মৃতদেহটী তুলিয়া গৃহে আনিলাম! আমি যাঁহার নিকট হইতে চিকিৎসা-বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছিলাম, তিনি একজন সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি অনেক গুপ্ত বিদ্যা জানিতেন, অনেক দৈবগুণসম্পন্ন দ্রব্যের বিষয় অবগত ছিলেন। তিনি আমাকে স্নেহবশতঃ সেই সকল বিদ্যা কিছু কিছু শিক্ষা দিয়াছিলেন—সেই শক্তিবলে আমি কন্যাটীকে পুনর্জ্জীবিত করিলাম। সেই অবধি সেই কন্যা, আমার কন্যা বলিয়াই জগৎসমীপে পরিচিত হইল। সেই অবধি আমিও সেই কন্যাকে আমার সকল সুখ দুঃখের উপলক্ষ করিয়া নবোদ্যমে নূতন করিয়া সংসার পাতিলাম। বাল্যের প্রণয়স্পৃহা বার্দ্ধক্যের অপত্যস্নেহে পরিণত করিয়া

কতকটা শান্তির সাক্ষাৎ পাইলাম। সেই দিন হইতে সেই কন্যা বুঝিল, আমিই তাহার জনক ; আমিও বুঝিলাম—”

বেণীপ্রসাদ আরও কি বলিতেছিলেন, কিন্তু হঠাৎ বিজয়চাঁদ বড় অস্থির হইয়া উঠিলেন। তাঁহার চক্ষু নিমীলিত হইয়া আসিল ; সমস্ত দেহে রক্তসঞ্চার প্রায় বন্ধ হইয়া গেল। বিজয়চাঁদ কাঁপিতে কাঁপিতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

“বৈদ্যরাজ ক্ষান্ত হউন, ক্ষান্ত হউন—আমার সে সহোদরা কে?”

বেণী। অস্থির হইও না, বিজয়চাঁদ, তোমার সে সহোদরা পদ্মাবতী!

বিজয়চাঁদ চক্ষু নিমীলিত করিলেন। জগতের সমস্ত আলোক তাঁহার সম্মুখে অকস্মাৎ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। বিজয়-চাঁদ অনন্ত আঁধারে ডুবিলেন—যে দিকে চাহিলেন, কেবলি দেখি-লেন—আঁধার! আঁধার! কেবলি আঁধার—অনন্ত আঁধার!! সেই আঁধারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হারাইয়া ফেলিতে ফেলিতে বিজয় ক্ষণকালের তরে নিজকেও হারাইয়া ফেলিলেন। বহুক্ষণ পরে যখন চৈতন্য ফিরিয়া আসিল, তখন দেখিলেন—কোথায়ও কেহ নাই—সব শূন্য, —বেণীপ্রসাদ চলিয়া গিয়াছেন!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—*—

যুবক-যুবতী।

প্রীত্ ন টুটে অনমিলে, উত্তম মনকি লাগ্।
শত যুগ্ পানিমে রহে, মিটেনা চক্‌মক্‌কে আগ্॥

তুলসীদাস।

লক্ষ্মণাবতীর শত ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্বে ভাগীরথীতীরে 'হরিতালী' বলিয়া একটী গ্রাম ছিল। গ্রামটী বড়ই ক্ষুদ্র, কিন্তু ক্ষুদ্র হইলেও অনেক কালের পুরাতন। তা'র সাক্ষী একটা ভাঙ্গা মস্‌জিদ্। মস্‌জিদ্‌টী প্রথমে একটী হিন্দুর দেব-মন্দির ছিল, তার পর বখতিয়ার খিলিজির বঙ্গ-বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে মস্‌জিদে পরিণত হইয়াছে। মন্দিরটী কতকাল পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার খবর কেহ রাখিত না। মস্‌জিদ্ হওয়ার পরে ইহা প্রায় খালিই থাকিত। পূর্ব্বে প্রতি শুক্রবারে চতুষ্পার্শ্বস্থ মুসলমানগণ একবার করিয়া আসিয়া এ স্থানে প্রার্থনা করিয়া যাইত; কিন্তু আজ কয়েক বৎসর যাবৎ এক ফকিরের আগমনে সেটুকুও উঠিয়া গিয়াছে। পাঠককে আপাততঃ একবার সেই স্থানে যাইতে হইবে।

ফকিরের নাম গোলাম হোসেন। গোলাম হোসেন একটু স্বতন্ত্র রকমের ফকিরী গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাধারণ ফকিরের সঙ্গে অনেক বিষয়েই তাঁহার অনৈক্য। গোলাম হোসেন, মাটিতে গা লাগিলে ফুঁ দিয়া ধূলা ঝাড়েন, অপরিষ্কার বস্ত্র গায় দিতে পারেন না, আলাপ ব্যবহারে কতকটা বিষয়ীর মত। তাঁহার চেহারাখানা

দিব্য গৌর—কতকটা আমিরী ধরণের—ফুট্‌ফুটে গুট্‌গুটে। দেখিলে ফকির বলিয়া মনে না হইয়া একজন আমীর ওমরাও বলিয়াই মনে হইত। গোলাম হোসেন আল্লার খবর অপেক্ষা সংসারের খবর অধিক রাখেন—দুনিয়ার সকল খবর লয়েন—কে কোথায় রাজা হইতেছেন, তাঁহার রাজ্যে কি ঘটনা ঘটিতেছে—দিল্লীতে কে সম্রাট্‌ হইলেন—তাঁহার পুত্রেরা কে কি করিতেছেন—ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি, বহু বিষয়ের সন্ধান করেন। তার পর সাংসারিক ভাবের তাঁহার আরও একটা নিদর্শন ছিল। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার এক দৌহিত্রী বাস করিত—তাহার নাম ফতেমা। গোলাম হোসেন বলিতেন, ফতেমার কেহ নাই, কাজেই তাঁহাকে তাহার ভার গ্রহণ করিতে হইতেছে, নতুবা সাধ করিয়া এ গরল কে কণ্ঠে ধারণ করিতে যায়? কোনরূপে তাহাকে পাত্রস্থা করিতে পারিলেই তিনি মুক্ত হন। কিন্তু কার্য্যতঃ তাঁহার সেরূপ কিছু আগ্রহ দেখা যাইত না। ফতেমা পরমা সুন্দরী, সুতরাং অনেকেই তাহার পাণিগ্রহণ করিতে আসিত; কিন্তু গোলাম হোসেন কাহাকেও দৌহিত্রী দিতে সম্মত হইতেন না।

কিন্তু এত গোল সত্বেও গ্রামের ভিতর গোলাম হোসেনের যথেষ্ট প্রতিপত্তি। চারিদিকের লোকেই তাঁহাকে অতিশয় ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। গ্রামবাসিগণ অনেক আদর যত্ন করিত, প্রতিবাসীরা ভালবাসিত। তাহার কারণ, তিনি কখনও কাহারও অপকার করিতেন না, যথাসাধ্য উপকার করিতেই চেষ্টিত থাকিতেন।

ফতেমা বড় সুন্দরী, যেন একটী ফুটন্ত মল্লিকা ফুল। মুসলমানের ঘরে কন্যাদায় নাই—ফতেমার বয়স হইয়াছিল, প্রায় সতের বৎসর। কিন্তু ফতেমা তবু বড় সরল, যেন ছোট্ট বালিকাটী।

ফতেমা পিতামহের জন্য রাঁধে, বাড়ে, অন্যান্য গৃহ কর্ম্ম করে এবং অবসর-কালে পাড়ার হাফেজের সহিত খেলা করিতে যায়। হাফেজ দরিদ্রের ছেলে—মা ভিন্ন তাহার সংসারে আর কেহ ছিল না,তার পর সে বড় মিষ্টস্বভাবসম্পন্ন। কাজেই ফতেমা ও হাফেজে বড় ভাব। উভয়ের মধ্যে একটা আত্মীয়তা জন্মিয়া গিয়াছিল। হাফেজের মাকে ফতেমা মা বলিয়া ডাকিত।

গোলাম হোসেন, হাফেজকে জানিতেন, হাফেজের মাকে জানিতেন, সুতরাং বয়স্কা হইলেও ফতেমাকে যথেচ্ছা হাফেজের আলয়ে যাতায়াত করিতে দিতে আপত্তি করিতেন না। এমন কি, হাফেজের এক মাতুলালয় ছিল; হাফেজও ফতেমা মধ্যে মধ্যে তথায় যাইয়াও মাস দুই মাস বেশ কাটাইয়া দিয়া আসিতে পারিত—গোলাম হোসেনের তাহাতেও অমত ছিল না। গোলাম হোসেন ভাবিতেন,'তবু যদি মেয়েটা সুখে থাকে।'

একদিন অপরাহ্নে, ফতেমা নদীর তীরে বসিয়া রেশমের টুপি বুনিতেছিল, এমন সময় সেখানে আসিয়া হাফেজ উপস্থিত হইল। হাফেজ ষোড়শ বর্ষীয় যুবক—তাহার উত্তম গৌরবর্ণ, উন্নত বক্ষ, দীর্ঘবাহু, অপরূপ জ্যোতিসম্পন্ন বড় বড় চক্ষু—তাহা হইতে দীপ্তি ও সরলতা উভয়ই ক্ষরিত হইতেছিল। হাফেজ আসিয়া পশ্চাৎ হইতে ফতেমার চক্ষু চাপিয়া ধরিয়া বিকৃত কণ্ঠে কহিল,—"বলত আমি কে?"

ফতেমা ধরিবা মাত্র তাহাকে চিনিতে পারিয়াছিল, সে দেশে তাহার দ্বিতীয় বন্ধু ছিল না। সে হাসিয়া কহিল, "তুমি আমার নফর।"

যুবক চক্ষু ছাড়িয়া দিয়া হাসিয়া কহিল,—"ফতেমা,সে ত আমার

হাফেজ ও ফতেমা।

ভাগ্যের কথা। এমন একটা মনিব পাইলে আমি বিনা বেতনে দাসত্ব করি!”

ফ। আমার নফর হইতে তোমার এত সাধ কেন, হাফেজ?

হা। কেন জান না? দিন রাত তোমায় দেখিতে পাইব বলিয়া। তোমায় দেখিতে পাইলে দিন রাত আমি না খাইয়া লইয়া কাটাইয়া দিতে পারি—যে!

ফ। বটে? তবে তুমি আমায় খুব ভালবাস,—কেমন?

হা। তা’তে আর সন্দেহ—খুব!

এই বলিয়া হাফেজ খুব হাসিল, ফতেমাও হাসিল। কিন্তু হাফেজ শীঘ্রই বড় গম্ভীর হইয়া গেল। কহিল,—“কিন্তু আপাততঃ যে মনিব ঠা’কুরাণীকে আমায় বিদায় দিতে হইতেছে। আমি আজ বিদেশে যাইব।”

ফ। কোথায়—মামার বাড়ী?

হা। গৌড়।

ফ। গৌড়!

হা। হাঁ।

ফ। সে কি?

হা। সেখানে আমার এক চাচা আছেন, চাচাজির সঙ্গে দেখা করিতে যাইব।

ফ। হঠাৎ চাচাজির কাছে যাইতে মন এমন উদ্বিগ্ন হইল কেন, হাফেজ?

হা। পেটের দায়ে। চাচাজি খবর দিয়াছেন, একটা ভাল চাকুরী জুটিয়াছে। তাই উপার্জ্জন করিতে যাইব।

ফতেমা একটু হাসিল। কহিল,—“হাফেজ, আমাকে দেখিলেই

না তোমার আহার নিদ্রা ঘুচিয়া যায়, তবে আর বিদেশে চাকরি করিতে যাওয়া কেন?"

হা। তুমি কি মনে কর, আমি নিজের পেটের দায়েই তোমাকে ছাড়িয়া যাইতেছি? তাহা নহে। মাকে কি খাওয়াইব—সেই জন্য যাইতে হইতেছে।

ফতেমা কতক্ষণ নীরব হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল। তাহার চক্ষু দু'টী ছল ছল করিয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া হাফেজ বড় কাতর হইয়া কহিল, "ফতেমা, তোমায় না দেখিয়া আমার বড় কষ্ট হইবে, কিন্তু কি করিব—পেটের দায়। তুমি ত জান, আমাদের একবেলা আহার জুটে না। নিজে উপবাস করি তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু মার কষ্ট যে আর দেখিতে পারি না।"

ফতেমার চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। কিন্তু সে শীঘ্রই আপনাকে পূর্ণ সম্বরণ করিয়া কহিল,—

"ভাল, এ উত্তম কথা। হাফেজ, তুমি মার কষ্ট দূর করিতে যাইবে, আমি ইহাতে বাধা দিব না।—আমার বড় কষ্ট হইলেও বাধা দিব না। কিন্তু তোমার চাচাজি কি কার্য্যে তোমায় আহ্বান করিয়াছেন, তাহা ত এখনও কিছু ভাঙ্গিয়া বলিলে না? সে কথা কিছু জানিতে পারিয়াছ কি?

হা। পারিয়াছি—সে এক অদ্ভুত কাজ!

ফ। কি সে অদ্ভুত কাজ, হাফেজ?

হা। নাসিরুদ্দিন সুবেদারের গল্প শুনিয়াছ ত? সেই যে রাজ্য ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছিল!

ফতেমা বিস্মিত হইয়া কহিল,—"হাঁ, শুনিয়াছি বৈ কি; তাঁহার কি হইয়াছে?"

হা। তাঁহার খবর পাওয়া গিয়াছে।

ফ। খবর পাওয়া গিয়াছে!

হা। হাঁ।

ফতেমা উত্তেজিত হইয়া উঠিল। কহিল, "কোথায় তিনি আছেন বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে?"

হা। তিনি গৌড়ের নিকটেই কোথাও ছদ্মবেশে বাস করিতেছেন।

ফ। গৌড়ের নিকটে কোন্ স্থানে?

হা। সেইটা এখনও ঠিক জানা যায় নাই। সেইটাই আমাকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইবে। সেই কার্য্যেই চাচাজি আমায় আহ্বান করিয়াছেন।

ফ। তা নাসিরুদ্দিন স্বর্গে থাকুন, মর্ত্ত্যে থাকুন, যেখানেই থাকুন, তা তোমার চাচাজির কি?

হা। জান না, তিনি যে গৌড়েশ্বরের সর্ব্বপ্রধান কোতোয়াল!

ফ। তবে গৌড়েশ্বরের কার্য্যেই তুমি নাসিরুদ্দিনকে অনুসন্ধান করিতে যাইতেছ?

হা। হাঁ।

ফ। ভাল, নাসিরুদ্দিনকে পাইলে গৌড়েশ্বর কি করিবেন, বুঝিতে পারিতেছ?

হা। নাসিরুদ্দিনকে কি করিবেন, তা আমি বলিতে পারি না; তবে তার এক দৌহিত্রী আছে, তাহাকে না কি নবাব বিবাহ করিবেন।

ফ। সে কোথায় আছে?

হা। তাঁহার সঙ্গেই।

ফ। তা'র নাম কি?

হা। দৌলত উন্নেসা।

ফতেমার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কহিল,—

"সে দেখিতে কেমন, হাফেজ?"

হা। দেখি নাই; শুনিয়াছি, তেমন সুন্দরী বঙ্গদেশে বিরল।

ফ। তা, নবাবকে দৌহিত্রী-দান সে ত সৌভাগ্য! নাসিরুদ্দিন বাহির হইয়া নিজ হইতেই তাঁহাকে নাতিনজামাই করে না কেন?

হা। জান ত, নাসিরুদ্দিনের ছেলে সামসুদ্দীন ফিরোজের চার ছেলে। তার মধ্যে দুইজন নব্যব হইয়াছেন। সিহাবুদ্দীন গৌড়েশ্বর হইয়াছেন। বাহাদুর এখনও স্বনামে রাজা হন নাই—সুবর্ণগ্রামে যথেষ্ট প্রতিপত্তি স্থাপিত করিয়াছেন—শীঘ্র তথাকার সর্ব্বেসর্ব্বা হইবেন। নাসিরুদ্দিনের ইচ্ছা সেই বাহাদুরকে দৌহিত্রী দেন।

ফ। কেন?

হা। বাহাদুরের সৌন্দর্য্য বেশী, গুণ বেশী, ক্ষমতাও বেশী।

ফ। ভাল, যদি তাই বাসনা হয়, তবে তাকেই দেন না কেন?

হা। কিন্তু বাহাদুরের কাছে যায় কে?

ফ। নাসিরুদ্দিন নিজে?

হা। দূর্ তা' কি পারে?

ফ। কেন—পারে না কেন?

হা। তাহা হইলে নাসিরুদ্দিনের বিপদাশঙ্কা আছে।

ফ। বাহাদুর কি দৌলৎউন্নিসাকে গ্রহণ করিবেন না?

হা। তাহা নহে, দৌলৎউন্নিসাকে বাহাদুর প্রাণে প্রাণে ভাল বাসে—সে আশঙ্কা নাসিরুদ্দিনের নাই। কিন্তু দৌলৎউন্নিসা এক,

নাসিরুদ্দীন আর—নাসিরুদ্দিনের আশঙ্কা নিজের জন্য। নাসিরুদ্দিন বাঁচিয়া থাকিলে সিহাবুদ্দীন ও বাহাদুর, উভয়েরই রাজ্য যাইবার আশঙ্কা আছে।

ফ। যিনি স্বেচ্ছায় রাজ্য ছাড়িয়া দিয়া আসিয়াছেন, তিনি আবার রাজ্য গ্রহণ করিতে যাইবেন? বিশেষতঃ এই বৃদ্ধ বয়সে?

হা। রাজ্যের লোভ আসন্ন-মৃত্যু বৃদ্ধও ছাড়িতে পারে না। নাসিরুদ্দিন দিল্লীশ্বর আলাউদ্দীন খিলিজির ক্রোধানল হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্যই রাজ্য-ত্যাগ করিয়াছিলেন; এখন সে আলাউদ্দীনও নাই, সে ভয়ও নাই। কাজেই নাসিরুদ্দিনকে আর কেহই বিশ্বাস করিবে না।

ফ। হাফেজ, তবে তুমি এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিও না।

হা। ফতেমা, বলিয়াছি ত, আমি স্বেচ্ছায় এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি নাই। জননীর নেত্রজল দর্শন করিয়াই এ নিষ্ঠুর কার্য্যে আমায় ব্রতী হইতে হইয়াছে।

ফ। কিন্তু নাসিরুদ্দিনকে পাইলে সিহাবুদ্দীন কি করিবেন, সেটা বুঝিতে পারিতেছ?

হা। কি করিবেন?

ফ। নিশ্চিত শূলে চাপাইবেন।

হা। অসম্ভব—একথা তোমায় কে কহিল?

ফ। আমি রাজাদের অনেক গল্প শুনিয়াছি—তাঁহারা এইরূপ করিয়া থাকেন।

হাফেজ কাঁপিয়া উঠিল। কহিল,—"বুড়ো মানুষকে শূলে চাপাইবে—এত নিষ্ঠুর!"

ফ। তবে তুমি কি মনে কর? তুমি কি মনে করিতেছ, নিমন্ত্রণ করিয়া কালিয়া কোর্ম্মা খাওয়াইবে?

হা। আমি বলি, জোর বন্দী করিয়া রাখিবে।

ফ। তুমি সিহাবুদ্দীনকে চেন না—তাই ওরূপ মনে করিতেছ।

হাফেজ একথা শুনিয়া চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। একদিকে মাতার চক্ষুজল—অন্যদিকে ভীষণ নিষ্ঠুরতা! হাফেজ কোন্ দিকে যায়? ফতেমাও চিন্তিত হইল। সে অনেকক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া একটা বুদ্ধি স্থির করিয়া, শেষটা কহিল,—

"শোন হাফেজ, আমি একটা পরামর্শ ঠিক করিয়াছি। এই পথই তোমায় এখন অনুসরণ করিতে হইবে। তাহাতে অর্থও উপার্জ্জন হইবে, নাসিরুদ্দিনও রক্ষা পাইবেন। চল আমরা উভয়েই সুবর্ণ-গ্রামে যাইয়া বাহাদুরকেই দৌলৎউন্নিসার খবর প্রদান করি। বাহাদুর যদি নাসিরুদ্দিনের সকল প্রকার অনিষ্টকার্য্য হইতে বিরত হন, তবেই তাহাকে আমরা দৌলৎউন্নিসার খবর দিব, নতুবা নহে। বাহাদুর কখনও নাসিরুদ্দিনের সাক্ষাৎ পাইবেন না। তিনি আমাদের কথায় স্বীকৃত হইলে, কেবল দৌলৎউন্নিসাকেই মাত্র আমরা সুবর্ণগ্রামে উপস্থিত করিয়া দিব, নাসিরুদ্দিন এখনও যেরূপ প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছেন, তখনও তেমনিই থাকিবেন। তাঁহার খবর কেহই জানিতে পারিবেন না।"

হাফেজ হাসিয়া কহিল,—"বেশ, বেশ,—আমার চাকুরী যে তুমিই গ্রহণ করিলে দেখিতেছি!"

ফ। আমি নাসিরুদ্দিনের খবর জানি—এ আমারই কাজ!

হাফেজ বিস্মিত হইল। কহিল,—"নাসিরুদ্দিনের খবর জান! বল কি?"

ফ। স্বরূপ কহিতেছি—বিশ্বাস কর। তোমাকে আর তাঁহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে না। এখন তুমি আমাকে স্বর্ণগ্রামে লইয়া যাইতে পারিবে কি না, সেই কথা বল।

হা। তোমার পিতামহ রাজি হইবেন কেন? বরং আমাকে খোঁজ বলিয়া দাও; আমিই তাহাদের সন্ধান করিয়া লইব।

ফ। সে হইবে না। আমি প্রতিজ্ঞা-পাশে বদ্ধ আছি, এক-জন ব্যতীত দু'জনের নিকট সে কথা ব্যক্ত করিব না। আমি নিজে যাইয়া, বাহাদুরকে এ কথা জানাইব।

হা। একজন ব্যতীত কেন?

ফতেমা হাসিল। কহিল,—"তা বুঝি বোঝ না? আমার বিবাহ হইলে, স্বামীর নিকট ত আর সকল কথা না কহিয়া পারিব না, তাই একজনের কথা বাদ দিয়া তবে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। তা' এখন তোমার খাতিরে স্বামীকে বাদ দিয়া বাহাদুরকেই কথাটা বলিতে হইতেছে, দেখিতেছি।"

মুখরা ফতেমার বাক্য শুনিয়া হাফেজ রাগ করিয়া একটা ক্ষুদ্র কিল তুলিল। কিন্তু কিলটী মুহূর্ত্ত-মধ্যেই আবার বাতাসের ভিতর অন্তর্হিত হইয়া গেল।

হাফেজের কথাটা জানিতে বড় আগ্রহ হইয়াছিল। তাই সে আবার কহিল,—"তা বাহাদুরকে বলিলেও একজনকে বলা হইবে, আর আমাকে বলিলেও ত একজনকেই বলা হইবে। আমাকেই বল না কেন?"

ফ। তোমাকে বলিলে বুঝি একজনকে বলা হইবে? তুমি যে আবার যাইয়া বাহাদুরকে বলিবে?

হা। সে ত আমি বলিব। তুমি ত একজনকেই বলিলে?

ফ। দু'জনকে জানাইলাম ত! সেটা প্রতারণার কার্য্য হইবে না? কিন্তু সে কথা যাক্—হাফেজ, মোট কথা আমি যাইব।

হা। সে যে অনেক দূর!

ফ। অনেক দূর তুমি যাইতে পার, আর আমি যাইতে পারিব না?

হা। ফকির সাহেব এ প্রস্তাবে রাজি হইবেন কেন?

ফ। তাঁহাকে আমি রাজি করিব—সে ভার আমার। আসিতে যাইতে কতদিন লাগিবে?

হা। ফিরিয়া আসিতে দু'মাসে কুলাইবে না।

ফ। তাহাকে বলিব, আমরা মামার বাড়ী যাইতেছি—তিন মাস পরে ফিরিব।

হাফেজ আর কি করে? অগত্যা স্বীকৃত হইল।

তখন উভয়ে অনেকক্ষণ ধরিয়া পরামর্শ আঁটিতে লাগিল। পরামর্শ করিয়া ঠিক করিল, তাহারা সেই রাত্রিতেই নৌকা করিয়া সুবর্ণগ্রাম রওয়ানা হইবে। গ্রামে একজন প্রাচীন মাঝি আছে; সে তাহাদিগকে অত্যন্ত স্নেহ করে—সে একথা কখনও কাহারও নিকটে প্রকাশ করিবে না—সেই তাহাদিগকে লইয়া যাইবে। তাহারা যে সুবর্ণগ্রামে যাইতেছে, একথা আপাততঃ হাফেজের জননী বা গোলাম হোসেন কেহই জানিবেন না। কার্য্যসিদ্ধ্যন্তে বাহাদুরের নিকট হইতে পুরস্কার লইয়া আসিয়া, যখন তাহারা বড়লোক হইবে, তখনই কথা প্রকাশ করিয়া দিয়া সকলকে একবারে আশ্চর্য্য করিয়া দিবে, ও সকলে মিলিয়া খুব হাসিবে। যুবক-যুবতী নানা সুখের স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। সে স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে একবারও ভাবিল না যে, প্রবাস-পর্য্যটন একবারে নিরবচ্ছিন্ন

সুখের কার্য্য নহে। উভয়েই আনন্দে উন্মত্ত! হাফেজের আনন্দ—ফতেমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবে, সর্ব্বদা নয়নসমক্ষে দেখিতে পাইবে, আর বিদেশ হইতে অর্থোপার্জ্জন করিয়া আনিয়া অচিরাৎ মাতার দুঃখ দূর করিবে।—কত সুখ! ফতেমার ভাব একটু স্বতন্ত্র। ফতেমার মনে তখন একটা বহুদিনের পুরাতন ছবি বার বার জাগিয়া উঠিতেছিল। ফতেমা ভাবিতেছিল,—বাহাদুর! বাহাদুর! কেমন সে বাহাদুর! বাহাদুর দৌলৎউন্নিসাকে ভালবাসে! আর দৌলৎউন্নিসা?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—*—

পথ-প্রদর্শক।

A plot, a plot, a plot, to ruin all!

Lord Tennyson.

হাফেজ ও ফতেমার নৌকা আসিয়া সুবর্ণগ্রামের ঘাটে লাগিল। ঘাট হইতে নগর কিছু দূরে। কোন্ দিক্ দিয়া নগরে যাইতে হইবে, কোন্ দিক্ দিয়া গেলে, শীঘ্র নগরে পৌছান যাইবে, নগরে পৌঁছিয়া কোথায় বাসা পাওয়া যাইবে, ইত্যাদি খবর দু'জনের একজনও অবগত নহে। সুতরাং হাফেজ নৌকা হইতে নামিয় প্রথমতঃ চারিদিক একবার ভাল করিয়া দেখিতে গেল।

নদীর তীরে একটী বৃক্ষতলে বসিয়া একজন মুসলমান ফকির

জলের দিকে চাহিয়াছিল। তাহার ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছিল, যেন সে কোন নৌকারোহীর প্রতীক্ষা করিতেছিল। হাফেজ আর কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া ধীরে ধীরে তাহারই নিকটে গেল। তার পর একটা কুর্ণিস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"ফকির সাহেব, সহরের পথটা বলিয়া দিতে পারেন ?"

ফকির সাহেব ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন, অনিন্দ্যসুন্দর যুবক! জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কোথা হইতে আসিতেছ, বাপু?"

হা। গৌড় হইতে।

ফকির সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইলেন। প্রশ্ন করিলেন,—

"গৌড় হইতে? কোথায় যাইবে?"

হা! আমি রাজ-কার্য্যে আসিয়াছি—সাজাদা বাহাদুর সাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইব।

ফকির অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নীরবে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তার পর কহিলেন,—

"আইস, আমিও সহরে যাইতেছি—পথ দেখাইয়া দিব।"

হা। আমার সঙ্গে আর এক জন লোক আছে।

ফ। কে?

হা। আমার এক ভগিনী—ফতেমা।

ফ। কোথায় সে?

হা। নৌকার ভিতরে—ঐ যে নৌকা।

ফ। বেশ, তাহাকেও রাস্তাতেই পাওয়া যাইবে—চল।

হাফেজ ফকির সাহেবের নিকট হইতে এত অধিক সাহায্য পাইবে, স্বপ্নেও ভাবে নাই। হঠাৎ এইরূপ অসম্ভাবিত উপায়ে এইরূপ একজন অসম্ভাবিত সাহায্যকারী পাইয়া তাহার ভারি আনন্দ

হইল। পথে ফকির তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি সাজাদার নিকট কি সংবাদ লইয়া আসিয়াছ?"

হাফেজ উত্তর করিল,—"ফকির সাহেব, বেয়াদবি মাপ হয়—রাজকার্য্য বিশেষ গোপনীয়, বিশেষ এ স্থলে আমিও সকল বিষয় অবগত নহি, আমার ভগিনীই কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে—এ বিষয়ে ফকির সাহেবের কৌতূহল নিবারণ করিতে পারিলাম না।"

ফকির আর উত্তর করিলেন না। চলিতে লাগিলেন। ক্রমে তাহারা আসিয়া নৌকার নিকটে পৌঁছিলেন।

সেই সময় পশ্চিমগগণে সুবর্ণধারা বর্ষিত হইতেছিল। দিনমণি প্রায় অস্তগত। তাঁহার শেষ মুহূর্ত্তের ক্ষীণ হাসিটুকু প্রকৃতির চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল; পাখীসকল নীড়ান্বেষণে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছিল; আর তাহাদের কলকণ্ঠ চারিদিকে ধ্বনিত হইয়া তরঙ্গলেখাপ্রস্ফুট হৈমকান্তির সহিত ঈষদান্দোলিতা তরণীর উন্মুক্তভাগোপবিষ্টা ফতেমার সুন্দর মুখখানিকে বড়ই মহিমময় ও রাগরঞ্জিত করিয়া তুলিতেছিল! প্রকৃতির মোহিনী মূর্ত্তি, সুন্দরীর সৌন্দর্য্য-বিভা, বিহঙ্গমগণের ও ক্ষুদ্র বীচিমালার কলধ্বনি, তদুপরি তরণীর তালে তালে চারু নৃত্য—সকলে মিলিয়া বড় সুর বাঁধিতেছিল। দুর্ভাগ্য ফকির সেই সুর অনুভব করিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার চক্ষু দুটী তৃষিত চাতকের মত কেবলি ফতেমার রূপরাশি পান করিতে লাগিল। ফকির কি তবে প্রেমের দেওয়ানা?

ফতেমা ফকিরের অবস্থা দেখিয়া লজ্জাবনতবদন হাফেজের দিকে ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হাফেজ, পথের সন্ধান পাইলে?"

হা। হাঁ, এই ফকির সাহেব সে কথা বলিয়া দিবেন, বলিতেছেন—শীঘ্র নামিয়া আইস।

ফতেমা নামিতে নামিতে উত্তর করিল,—"সন্ধ্যা হইয়া গেল যে। অপরিচিত স্থান—হঠাৎ যাইয়া কোথায় আশ্রয় লইবে?"

ফকির এতক্ষণ ফতেমার দিকেই তাকাইয়া ছিলেন,—ফতেমার মধুরকণ্ঠধ্বনিতে তাঁহার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। তিনি কহিলেন, "সে জন্য চিন্তা কি বালিকে, আমার সব জানা শুনা আছে—আমার সঙ্গে আইস, আমিই সব বন্দোবস্ত করিয়া দিব।"

ফকির সাহেবের হাব ভাব ফতেমার বড় ভাল লাগিল না। সে কহিল, "তা আসিয়াছি যখন, এক জায়গায় থাকিলেই চলিবে—সে জন্য ফকির সাহেবকে তত কষ্ট দিয়া প্রয়োজন কি? ফকির সাহেব অনুগ্রহ পূর্ব্বক পথের সন্ধানটা বলিয়া দিন্—তাই যথেষ্ট।"

ফ। কষ্ট? সে কি? আমার কষ্ট কি? পরিচিত ভাল আবাস-স্থান আছে, দেখাইয়া দিব—তাতে আবার কষ্ট কি? এ ত কর্ত্তব্য কাজ! আইস—আমার সঙ্গে আইস।

ফকির পথ দেখাইয়া চলিলেন। হাফেজ তাঁহার পিছনে পিছনে গেল। অগত্যা ফতেমাও চলিল। ফকির সাহেব গ্রাম, মাঠ পার হইয়া অবশেষে নগরে পড়িলেন। সন্ধ্যার কিরণে হিন্দু-রাজধানী তখন উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করিয়াছে, বহুসংখ্যক দেবমন্দিরের উচ্চ চূড়াগুলি তখনও সূর্য্যকিরণে জ্বলিতেছে। নগরের চতুর্দ্দিক শঙ্খ ও ঘণ্টার রোলে-প্রতিধ্বনিত হইতেছে। হাফেজ ও ফতেমা এই অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। ক্রমে সন্ধ্যার ছায়া ধীরে ধীরে নামিয়া আসিয়া ধরাতল প্লাবিত

করিল। সেই আঁধারের ভিতর দিয়া অনেক ছোট বড় রাস্তা পার হইয়া অবশেষে ফকির একটা ভগ্ন অট্টালিকার দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। হাফেজ জিজ্ঞাসা করিল,—"এই কি?"

ফ। হাঁ, এই সেই স্থান। এই খানেই তোমরা বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিবে। ভিতরে সব বন্দোবস্ত রহিয়াছে. আইস দেখাইয়া দিতেছি।

তখন তিন জনে ভিতরে ঢুকিল। একটা পরিষ্কার ঘরের নিকটে আসিয়া ফকির কহিলেন, "এইটা জেনানা মহল। তুমি এখানে থাকিতে পাইবে না—এই খানে তোমার ভগিনী থাকিবে। তাহাকে একবার ভিতরে যাইয়া দেখিতে বল দেখি, এ ঘরে অপর কেহ আছে কি না।"

ফতেমা ঘরে ঢুকিয়া দেখিতে গেল, আর কেহ আছে কিনা; কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে একটা আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটিল। হঠাৎ সেই ফকির সেই ঘরের শিকল টানিয়া দিয়া, বাহির হইতে কপাট বন্ধ করিয়া দিল।

হাফেজ আশ্চর্য্য হইয়া কহিল,—"এটা কি করিলে?"

ফ। পাখীকে খাঁচায় পূরিলাম। তুমি এখন যথেচ্ছা গমন করিতে পার। তোমার চক্ষু বন্ধ করিয়া আবার আমি তোমায় সেই নদী-তীরে রাখিয়া আসিব।

"আর সয়তান, এইরূপে আমি তোমার মুণ্ডপাত করিব"—এই কথা কহিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে হাফেজ আপনার উজ্জ্বল তরবারি খাপমধ্য হইতে নিষ্কোষিত করিল। অন্ধকার ঘরে বাহির হইতে একটী দীপরশ্মি প্রবেশ করিতেছিল, সেই আলোকরশ্মিতে উহা ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সেই মুহূর্ত্তে আর একখানা তরবারিও

সেইরূপ আলোক বিকীর্ণ করিল। হাফেজ দেখিল, ছদ্মবেশ হইতে শাণিত অস্ত্র মুক্ত করিয়া ভণ্ড ফকিরও এক লম্ফে তাহার উপর লাফাইয়া পড়িল।

হাফেজ এই অতর্কিত আক্রমণের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না; সুতরাং সে আক্রমণ সহ্য করিতে পারিল না—হঠাৎ পড়িয়া গেল। বিশেষ ফকিরের অস্ত্রশিক্ষা চমৎকার! ফকির যুবকের বুকের উপর জানু পাতিয়া বসিয়া, তাহার নাকের ছিদ্রদ্বয়ে ঘন ঘন কিসের উৎকট রস মর্দ্দন করিয়া দিতে লাগিল। মুহূর্ত্তমধ্যে হাফেজের শরীর অবশ হইয়া আসিল, মাথা ঘুরিতে লাগিল, চক্ষু মুদ্রিত হইল। হাফেজ আর কিছু অনুভব করিতে পারিল না। তাহার চৈতন্য বিলুপ্ত হইল।

কতক্ষণ হাফেজ এইভাবে ছিল, তাহা সে ঠিক বুঝিতে পারিল না। কিন্তু যখন তাহার চৈতন্য হইল, তখন সে দেখিল, নবীন-তপন-কিরণে চারিদিক্ উদ্ভাসিত হইয়া গিয়াছে,—বিহঙ্গমগণ কলরব করিতেছে, আর ব্রহ্মপুত্রের জলরাশি মৃদু-মারুত-সঞ্চালনে তালে তালে নাচিতেছে—আর তরঙ্গের মস্তকে মস্তকে অপূর্ব্ব মুক্তারাশি ঝলসিতেছে। হাফেজ বুঝিল, তাহার অজ্ঞানাবস্থায় একরাত্রি সম্পূর্ণ কাটিয়া গিয়াছে। বিষাক্ত রসের আঘ্রাণে তখনও তাহার মস্তক ঘূর্ণিত হইতেছিল—সকল কথা, সকল বিবরণ, ভাল করিয়া মনে হইতেছিল না। তাহার কেবল বোধ হইল, যেন কে তাহার শিয়রে বসিয়া তাহার মস্তকে ঘন ঘন কি এক তরল পদার্থ লেপন করিতেছে। হাফেজ জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি কে?—ফতেমা?"

শিরোভাগোপবিষ্ট ব্যক্তি উত্তর করিল,"ফতেমা কে জানি না—

তাহার খবর পরে লইব। এখন তোমার অবস্থা কেমন বোধ করিতেছ—সেই কথা বল। হাঁটিয়া যাইতে পারিবে কি ?"

হাফেজের ক্রমে ক্রমে সকল কথা মনে পড়িতে লাগিল। কহিল,—"চেষ্টা করিলে বলিতে পারি। কিন্তু কোথায় যাইব ?"

সে ব্যক্তি কহিল,—"আমার আশ্রমে। তোমার শরীরে কেহ উৎকট বিষ মাখাইয়া দিয়াছে ! ইহাতে নিশ্চিত তোমার প্রাণনষ্ট হইত।—আমি বিষের চিকিৎসা জানি, তাই কোন রকমে চৈতন্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হইয়াছি। কিন্তু বিপদ এখনও সম্পূর্ণ কাটিয়া যায় নাই ; ঘরে লইয়া গিয়া আরো ভালরূপ তোমায় শুশ্রূষা করিতে হইবে, নতুবা তোমার শরীর ঠিক হইবে না। দেখ দেখি, আমার কাঁধে ভর দিয়া চলিতে পার কিনা ?"

হাফেজ তখন উঠিতে চেষ্টা করিল। একবার উঠিয়াও দাঁড়াইতে পারিল না—পড়িয়া গেল, তার পর আবার চেষ্টা করিয়া উঠিল—আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে দাঁড়াইল। অবশেষে আশ্রয়দাতার স্কন্ধে ভর করিয়া কষ্টেস্বষ্টে মৃদুমন্দ পদবিক্ষেপে চলিতে লাগিল।

পথে হাফেজ জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে ?"

সেই লোক উত্তর করিল,—"আমার নাম বেণীপ্রসাদ, আমি পূর্ব্বে চিকিৎসা-ব্যবসায় করিতাম, এখন সন্ন্যাসী হইয়াছি। তুমি কে ? দেখিতেছি, বিদেশী—জাতিতে মুসলমান।"

হা। আমি গৌড় হইতে আসিতেছি, কিন্তু আমার সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে, এক ভণ্ড ফকির আমার ভগিনীকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে। হয়ত এতক্ষণ তাহাকে নানারূপ নির্য্যাতন করিতেছে। আমি কি করিব, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। একে বিদেশী, তাহাতে আবার নবাগত—কি করিয়া আমি এই অপরিচিত স্থলে

ভগিনীকে দস্যুকবল হইতে রক্ষা করিব? হায় কেন সুবর্ণগ্রামে আসিয়াছিলাম? কেন আমার এ কুবুদ্ধি হইয়াছিল? আমি কিরূপে গোলাম হোসেনের সহিত আবার যাইয়া সাক্ষাৎ করিব—কিরূপে আবার তাঁহার মুখ দেখাইব!

বেণীপ্রসাদ সব কথা বুঝিলেন না। কিন্তু এইটুকু বুঝিলেন যে, তাঁহার পদ্মাবতীর মত আর একটী মুসলমান রমণীও আজ দস্যুকরে পতিতা। তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"হরি, হরি, আবার রমণীর অপহরণ নাকি? মুসলমান ফকিরে লইয়া গিয়াছে! কে সে মুসলমান ফকির, কিরূপ সে মুসলমান ফকির?"

হাফেজ ফতেমার চিন্তায় অভিভূত ছিল—সে চিন্তায় নিজকষ্ট অনেকটা ভুলিয়া গিয়াছিল। এখন বেণীপ্রসাদের কথা শুনিয়া বলিয়া উঠিল,—"সে কি মহাশয়! আরও কেহ চুরি গিয়াছে নাকি?"

বেণীপ্রসাদ আর উত্তর করিলেন না। কহিলেন—"এক্ষণে, আশ্রমে চল। ব্যাপার বড় বিষম, বোধ হইতেছে। ইহার নিশ্চয় প্রতীকার করিতে হইবে, ইহার প্রতিফল নিশ্চিত দিতে হইবে। হিন্দুর রাজধানীতে এরূপ কাণ্ড আর কেহ কখন ও দেখে নাই। এ ভয়ঙ্কর কাণ্ডের নিশ্চয় প্রতিকার করিতে হইবে। চল, শীঘ্র হাঁটিয়া চল—আশ্রমে পৌঁছিয়া সকল কথা জ্ঞাত হইব এখন।"

তখন উভয়ে আশ্রমাভিমুখে চলিল। বেণীপ্রসাদ এক্ষণে সংসার-ত্যাগী। সুবর্ণগ্রামের বাহিরে একটী নির্জ্জন স্থলে বৃক্ষাদিবেষ্টিত একটী পর্ণকুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। হাফেজকে তথায় লইয়া গেলেন। সেখানে যথাযোগ্য শুশ্রূষায় শীঘ্রই হাফেজ সুস্থ হইল। তখন মুহূর্ত্ত কাল বিলম্ব না করিয়া উভয়ে উভয়ের কথা শুনিল।

সমাবস্থায় জাতিভেদ ধর্ম্মভেদ ঘুচিয়া যায়। উভয়ে উভয়ের সাহাযার্থে প্রস্তুত হইল। বেণীপ্রসাদ হাফেজের ন্যায় যুবকের সাহায্য পাইয়া পদ্মাবতীর অনুসন্ধানে দ্বিগুণ উৎসাহিত হইলেন। হাফেজও বেণীপ্রসাদকে পাইয়া অন্ধকারের ভিতরে পথ দেখিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—*—

হাফেজের সঙ্কল্প।

One prop he has, and only one,—

W. Wordsworth.

ইহার পর কয়েক দিন কাটিয়া গেল। এই কয় দিনে বিজয়চাঁদ, বেণীপ্রসাদ ও রাজারাম পদ্মাবতীর যথাসাধ্য অনুসন্ধান করিলেন; বেণীপ্রসাদ ও হাফেজ ফতেমারও যথাসম্ভব খোঁজ তল্লাস করিলেন—কিন্তু কি আশ্চর্য্য, কাহারও কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

বিজয়চাঁদ পদ্মাবতীর আশা বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন—আপনার কলঙ্ক কাহিনী মনে করিয়া দিবানিশি উৎকট অনুতাপানলে দগ্ধীভূত হইতেছিলেন। কিন্তু পদ্মার প্রেম, পদ্মার আশা, পদ্মার প্রতি নিজের অনুরাগ-ভালবাসা সকল বিস্মৃত হইতে পারিলেও পদ্মার সুখ-দুঃখের চিন্তাটুকু হইতে বিজয়চাঁদ কি করিয়া অব্যাহতি লাভ করিবেন? যাহাকে যৌবনের প্রথম উন্মেষেই প্রণয়ের চক্ষে দর্শন করিয়াছেন, তাহাকে কি এত শীঘ্রই ভুলিয়া যাওয়া সম্ভব? যাহাকে

সারা জীবনের সুখদুঃখের চিরসঙ্গিনী করিবার আকাঙ্ক্ষায় এতদিন হৃদয়ে স্থান দিয়া আসিয়াছেন, তাহাকে কি এত সহজেই বিস্মৃত হওয়া সম্ভব? যাহাকে জীবনের একমাত্র অবলম্বন করিয়া সংসার পাতিবেন বলিয়া, আশার কুটীর রচনা করিতেছিলেন, তাহাকে কি মুহূর্ত্ত-মধ্যেই বিস্মৃতির অতলগর্ভে নিক্ষিপ্ত করা স্বাভাবিক? হৃদয়ের অস্থিথণ্ডদ্বারা নির্ম্মিত নববিকশিত প্রণয়ের প্রথম সুকুমার অবলম্বন —সে চারু প্রতিমা বিজয় কি করিয়া হঠাৎ বিস্মৃত হইবেন? সে নির্ম্মল, উজ্জ্বল, স্থির-সৌদামিনী, সে অরুণরাগরঞ্জিত নিবাত-নিষ্কম্প বারিরাশিরক্ষিত প্রফুল্লপঙ্কজিনী, সে নীলাকাশবিহারিণী তরুণ শশিকলা। কি করিয়া অদৃষ্টের একটী অঙ্গুলি-হেলনেই তিনি ভুলিয়া যাইবেন? সে দুর্দ্দিনের প্রীতি প্রফুল্লভাস্কর—তমসাবৃতরজনীর ক্ষণান্ধকারবারিণী অস্থায়ী কৌমুদী, সেই আধ তীব্র—আধ গম্ভীর, আধ হাসি—আধ বিষাদ, আধ মুক্ত—আধ সঙ্কুচিত, আধ প্রেম—আধ করুণার ভাব, বিজয়চাঁদ কি করিয়া দুদিনেই আপনার মানস-পট হইতে লুপ্ত করিবেন? বিজয় তা' পারিলেন না। অনেক চেষ্টা করিয়াও পারিলেন না। পাঠকের দুর্ভাগ্য, পাঠিকার দুর্ভাগ্য, আর এ অধম গ্রন্থকারেরও দুর্ভাগ্য, বিজয় তা' পারিলেন না! বিজয়চাঁদ সকল আশা বিসর্জ্জন করিয়াও পদ্মাবতীর সুখশান্তি-বিধানের স্পৃহাটুকু পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। তা' যদি পারিতেন, তবে আমরা বুঝিতাম, তিনি স্বার্থপর, কাপুরুষ, দুর্ব্বলচিত্ত;—তবে এইখানেই লিখনী বন্ধ করিয়া আজ পাঠক-পাঠিকার নিকট বিদায় গ্রহণ করিতাম। কিন্তু তাহা হইল না। বিজয় দৈবের নিষ্ঠুর পীড়নে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়াও যথাসাধ্য পদ্মাবতীর অনুসন্ধান করিলেন; ভগিনীর সুখদুঃখের চিন্তায়—নিজের নহে—কাতর হইয়া অকাতরে অর্থ-

ব্যয়পূর্ব্বক দেশদেশান্তরে লোক প্রেরণ করিলেন, নানাস্থানে নানা গুপ্তচর নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু হায়, এত করিয়াও কি ফল হইল? কিছুতেই কিছু হইল না—পদ্মাবতীর কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। বিজয়চাঁদ, বেণীপ্রসাদ ও রাজারাম, সকলেরই অক্লান্তপরিশ্রম ব্যর্থ হইল। একটী নৈরাশ্যের ছায়া আসিয়া ক্রমে ক্রমে তাহাদের তিনটী হৃদয়ই অন্ধকারময় করিয়া তুলিল।

বলা বাহুল্য, ফতেমার দশাও তদ্রূপ দাঁড়াইল। হাফেজ প্রাণপণ করিলেন—বেণীপ্রসাদ যথাসাধ্য সহায়তা করিলেন, কিন্তু সব মিথ্যা হইল। ফতেমাও পদ্মাবতীর মত তেমনই অজ্ঞাত রহিয়া গেল।

হাফেজের হৃদয় ও ক্রমে ক্রমে ভাঙ্গিয়া আসিতেছিল। কিন্তু এই সময়ে তাহার মনে সহসা একটা বৃহৎ কথা উদিত হইল। হাফেজ চিন্তা করিয়া দেখিল, তাহাদের এই সুবর্ণগ্রামে আগমনের সঙ্গে এবং ফতেমার পুনরুদ্ধারের সহিত আর এক জন প্রবল প্রতাপশালী মহাপুরুষের স্বার্থ বিশেষভাবে জড়িত রহিয়াছে। সে ব্যক্তি আর কেহ নহে—স্বয়ং সাজাদা বাহাদুর! এই কথা মনে হওয়ায়, হাফেজের বিষাদক্লিষ্ট মুখখানি আশার একটী ক্ষীণ আলোকে অকস্মাৎ বড় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। হাফেজ বিচার করিয়া দেখিল, ফতেমার উদ্ধারসাধন হইলে হাফেজের যত লাভ, বাহাদুরের তদপেক্ষা কম নহে। ফতেমা মুক্ত হইলে হাফেজের যেমন ভগিনী লাভ হয়, বাহাদুরেরও তেমনি দৌলৎউন্নিসা লাভ হয়। বাহাদুর দৌলৎ-উন্নিসার প্রার্থনাকাঙ্ক্ষী—দৌলৎউন্নিসার জন্য সিহাবুদ্দীনের প্রতিদ্বন্দ্বী—সেই দৌলৎউন্নিসার খবর ফতেমার হাতে। সুতরাং হাফেজ সিদ্ধান্ত করিল, বাহাদুরকে এ সংবাদ প্রদান করিলে নিশ্চিতই

বাহাদুর নিজে হইতেই ফতেমার অনুসন্ধান করিবেন—আর বাহাদুর অনুসন্ধান করিলে নিশ্চিতই ফতেমার উদ্ধার সাধিত হইবে।

হাফেজ মনে মনে ঠিক করিল, শুভকার্য্যে অধিক বিলম্ব করিতে নাই—সে সেদিনই বাহাদুরের উদ্দেশে গমন করিবে। বেণীপ্রসাদকে এ পর্য্যন্ত হাফেজ তাহাদের সুবর্ণগ্রামে আগমনের প্রকৃত কারণ ভাঙ্গিয়া বলে নাই। তাহার কারণ, হাফেজ জানিত, রাজা-রাজড়ার কথা যা'র তা'র নিকটে প্রকাশ্য নহে। বিশেষ, বর্ত্তমান কথা দৌলৎউন্নিসাকে লইয়া—যে দৌলৎউন্নিসাকে লইয়া বাহাদুর ও সিহাবুদ্দীনে বিবাদ, সেই দৌলৎউন্নিসাকে লইয়া। সুতরাং একথা সাধারণ্যে প্রকাশিত হইলে, হাফেজ ও ফতেমা উভয়েরই যে বিশেষ অমঙ্গল ঘটিতে পারে, হাফেজ সে'টা বুঝিয়াছিল। তাই বেণীপ্রসাদের নিকটেও তাহা সে এ পর্য্যন্ত প্রকাশ করিতে পারে নাই। হাফেজ ঠিক করিল, এ কার্য্যও সে বেণীপ্রসাদের অজ্ঞাতেই সম্পন্ন করিবে—আজও সে বেণীপ্রসাদের অজ্ঞাতেই বাহাদুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইবে। হাফেজ সন্ধ্যার সময়ে এই সঙ্কল্প লইয়াই গৃহত্যাগ করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—*—

রাজারাম কে ?

Q.—What news ?
Ans.—Such news, my lord, as grieves me to unfold.

King Richard III.

নগরের এক পার্শ্বে মৃন্ময়প্রাচীরবেষ্টিত বাহাদুর সাহের সুরম্য আলয়। বাহাদুরের আলয়ে আজ বড় আমোদ প্রমোদ। বাহাদুর বঙ্গেশ্বর ফিরোজসাহকর্ত্তৃক সুবর্ণগ্রামবিজয়ে প্রেরিত হইয়াছিলেন—আপনার অতুল বিক্রম এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধিপ্রভাবে তৎকার্য্যসাধনে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন—সুতরাং নগরে তাঁহার বিশেষ আধিপত্যই বিস্তৃত হইয়াছিল! বাহাদুর স্বনামে রাজত্ব গ্রহণ না করিলেও, প্রকৃতপক্ষে সুবর্ণগ্রামের মঙ্গলামঙ্গল, শুভাশুভ, তাঁহারই উপর নির্ভর করিত। তিনি বুদ্ধিমান্ লোক ছিলেন—সুতরাং বুঝিয়াছিলেন যে, রাজ্যশাসনের ভার প্রথমতঃ হিন্দুর হাতে না রাখিলে, হিন্দু নির্ব্বিবাদে কখনও বশ্যতা স্বীকার করিবে না আর যুদ্ধবিগ্রহে হিন্দুকে পরাজিত করিয়া রাজ্যগ্রহণ করিলেও, সে রাজত্ব অধিক দিন টিকিবে না। জোর করিয়া রাজ্যরক্ষা কতদিন চলে ?—হিন্দু প্রজা চিরকাল মুসলমান রাজার প্রতিকূলতাচরণ করিবে। বাহাদুর তাই প্রকৃতপক্ষে সুবর্ণগ্রামের মালীক হইয়াও রাজ্যশাসনভার বল্লালের উপরই রাখিলেন—কেবল একডালা, এগারসিন্দুর প্রভৃতি দুর্গগুলি নিজের করায়ত্তে আনিয়া তাহাতে সৈন্য সন্নিবিষ্ট

করিলেন। বাহাদুর সঙ্কল্প করিলেন, হিন্দুর বাহুবল জয় না করিয়া, হিন্দুকে হিন্দুর শাসনে রাখিয়া তিনি তাহাদের হৃদয় জয়পূর্ব্বকই আপন রাজত্বের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিবেন। প্রায় তিন শতাব্দী পরে প্রতাপান্বিত আকবর সাহ যে সাম্যনীতি ও সদ্ভাব-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা-ক্ষেত্রে বিজয়লাভপূর্ব্বক হিন্দুস্থানে এক বিশালসাম্রাজ্যস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই সাম্যনীতি ও সদ্ভাব-মন্ত্রের সাহায্যেই বাহাদুরও পূর্ব্ববঙ্গ জয় করিতে উদ্যত হইলেন! হায়, যদি পরশ্রীকাতরতা, হিংসা, দ্বেষ এবং গৃহ-কলহ হিন্দুকেই এই হিন্দুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত না করিত, তবে আজ হয়ত বাহাদুরের সুখ-স্বপ্ন সফল হইত—তবে হয়ত বাঙ্গালার ভাগ্যচিত্র আজ ভিন্নরঙ্গে রঞ্জিত হইত—তবে হয়ত আজ এই সহৃদয় মহাপুরুষের দৃষ্টান্তে হিন্দু ও মুসলমান, এই দুই শক্তি একত্র গ্রথিত হইয়া বাঙ্গালীর সুখ, শান্তি, বল, বিক্রম চিরকালের জন্য বাঙ্গালারই গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ করিয়া রাখিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাহাদুর বিধর্ম্মী হইয়া বিধর্ম্মীর প্রতি যে সততা ও সাম্যনীতি প্রদর্শন করিতে পারিলেন, হিন্দু হিন্দু হইয়াও, হিন্দুর প্রতি তাহা প্রদর্শন করিতে পারিল না! এই দোষেই সর্ব্বস্ব গেল—এই দোষেই ত বাঙ্গালী চিরপদানত হইল! বাঙ্গালি, তোমার অধঃপতনের জন্য তুমি পরকে দায়ী করিতে চাও—কিন্তু একবার নিজের প্রতিমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া দেখ! তুমি পরকে দোষী করিতে চাও, যে পর, সে ত তাহার স্বার্থের সমীপে তোমার স্বার্থ বলি দিতেই চাহিবে—এ'টা ত তাহার ধর্ম্ম। কিন্তু তুমি যে নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার বশবর্ত্তী হইয়া নিজের সর্ব্বনাশ নিজে করিলে তাহার কি? সেই কথাটা একবার ভাবিয়া দেখ দেখি?

এ সম্পর্কে কেশবলালের কথাটা পাঠককে একবার ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। কেশবলাল কে, কি বৃত্তান্ত, তাহা এখনও পাঠককে বিশেষ করিয়া বলা হয় নাই। কেশবলাল সুবর্ণগ্রামাধিপতির কোষাধ্যক্ষ! তিনি বল্লালের অতি প্রিয় ও বিশ্বাসী কর্ম্মচারী ছিলেন। কিন্তু কুক্ষণেই তাহার সহিত পান্নার দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছিল—সেই দেখা সাক্ষাৎ হইতেই কেশবলালের সর্ব্বনাশ হইল—সুবর্ণগ্রামে অমঙ্গল প্রবেশ করিল। সেই অবধি কেশবলাল ভুলিয়া ভুলিয়া গেলেন; মান, গৌরব, সততা, মনুষ্যত্ব সকল ভুলিয়া কেশব পান্নাকে হৃদয়ে স্থান দিলেন—সেই অবধি সুবর্ণগ্রামের সর্ব্বনাশ সূচিত হইল। কেশবলাল প্রথমে নয়নচাঁদের নিকট পান্নার পাণিভিক্ষা করিয়াছিলেন—কিন্তু যখন জানিলেন, নয়নচাঁদ তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিতে রাজি নহেন, তখন তিনি ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানরহিত হইয়া আত্মশক্তিতেই সেই প্রণয়পাত্রীলাভে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। আত্মশক্তিতে তাহাকে লাভ করিতে হইলে আত্মশক্তি বিশেষ বৃদ্ধি করা আবশ্যক; কারণ, নয়নচাঁদ দুর্ব্বল ছিলেন না। সুতরাং কেশব সেই অবধি নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। সেই সময়েই বাহাদুরের সেনাপতি হাসিমের সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। হাসিম বাহাদুরের বেতনভোগী হইলেও, সিহাবুদ্দীনের কার্য্যেই সুবর্ণগ্রামে আসিয়াছিলেন—ছলে, বলে, কৌশলে সুবর্ণগ্রামকে মুসলমানের শাসনে আনিতে পারিলে, সিহাবুদ্দীন তাঁহাকে সুবর্ণগ্রামের শাসনকর্ত্তা করিবেন, এমত আশ্বাস দিয়াছিলেন। হাসিম সেই লোভেই সুবর্ণগ্রামের ছিদ্রান্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। এখন এই দুই স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি একত্রিত হইয়া উভয়েই উভয়কে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। কেশব তাঁহাকে সুবর্ণগ্রামের সকল গুপ্ততত্ত্ব

প্রদান করিতে স্বীকৃত হইলেন—এবং প্রয়োজন হইলে রাজকোষও সিহাবুদ্দীনের কার্য্যে ঢালিয়া দিবেন, বলিলেন; হাসিম আপন সৈন্যবলের সাহায্যে তাঁহাকে তৎপরিবর্ত্তে 'পান্না' প্রদান করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। একখানি সুন্দর মুখের জন্য কেশব সুবর্ণগ্রামের সর্ব্বনাশ করিতে অগ্রসর হইলেন—হিন্দু হইয়া হিন্দুর বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন—বাঙ্গালী হইয়া বঙ্গধ্বংসের উদ্যোগ করিলেন! হায়, সুন্দর মুখ! হায়, মূর্খ বাঙ্গালি! হায়, হতভাগ্য হিন্দু! পাঠক পাঠিকা কথাটা একবার ভাবিয়া দেখ দেখি?

আসল কথা ছাড়িয়া অন্য কথা কহিয়া লাভ নাই, কিন্তু মনের আবেগে কথায় কথায় আমরা অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। এখন যে কথা বলিতেছিলাম সেই কথা বলি। এইরূপে প্রকৃত রাজা হইয়াও রাজ্যভার গ্রহণ না করিয়া, বাহাদুর যেমন বুদ্ধিমানের কার্য্য করিয়াছিলেন, তেমন শান্তিতেও ছিলেন। সকলেই তাঁহাকে রাজার ন্যায়ই ভক্তিশ্রদ্ধা করিত, অথচ তিনি কার্য্যের অভাবে বেশ আমোদপ্রমোদেও কাল ক্ষয় করিতে পারিতেন। তাঁহার সুরম্য আলয়ে প্রতিদিন সুললিত সঙ্গীতধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইত। প্রতিদিন সন্ধ্যার ছায়া বিদীর্ণ করিয়া তাহার বাতায়ন-পথ হইতে শত-শত উজ্জ্বল আলোকরশ্মি আকাশ-পথে ধাবিত হইত, প্রতিদিন মধুর নৃত্যধ্বনিতে রাজপথবাহী পথিকবৃন্দের শ্রবণকুহর পরিতৃপ্ত হইয়া যাইত। কিন্তু এই বিপুল বিলাসিতার ক্রোড়ে অহরহঃ লালিত পালিত হইয়াও বাহাদুরের চরিত্র কিম্বা মনুষ্যত্ব নষ্ট হয় নাই। পাঠক তাহা অচিরাৎ দেখিতে পাইবেন।

যে দিন হাফেজ বাহাদুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিল—বাহাদুরের আলয়ে নিত্য যেমন আমোদস্রোত প্রবাহিত হইত, সেদিনও

তেমনি আমোদস্রোত প্রবাহিত হইতেছিল। হাফেজ সেই বৃহৎ অট্টালিকা, সেই বহুবিস্তৃত প্রাচীর, ও সেই আমোদ-তরঙ্গের উচ্চ ধ্বনি ও শতশত উজ্জ্বলদীপের বহুদূরবিস্তৃত রশ্মিমালা প্রত্যক্ষ করিয়া অবাক্ হইয়া গেল। বাহাদুর এত বড়? তা'ত হাফেজ কখনো ভাবে নাই। এই অনন্ত ঐশ্বর্য্যসম্পদের গণ্ডী ভেদ করিয়া সে কিরূপে বাহাদুরের সমীপবর্ত্তী হইবে? হাফেজ ভাবিতে ভাবিতে সিংহদ্বারের নিকট উপস্থিত হইল। সেখানে উন্মুক্ত-অসি-হস্তে প্রহরী প্রহরায় নিযুক্ত ছিল। সে তাহাকে ভিতরে গমনোদ্যত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কে তুমি—কোথা যাও?"

হাফেজ কহিল,—"আমি সাজাদার সঙ্গে দেখা করিতে যাইব—আমাকে পথটা দেখাইয়া দিবে?"

প্রহরী বিস্মিত হইয়া হাফেজের মলিন বস্ত্রের দিকে বারবার দৃষ্টি করিতে লাগিল। তার পর কহিল,—"তোমার পরওয়ানা আছে?"

হাফেজ উত্তর করিতে পারিল না। পরওয়ানা কি,সে তা ভালরূপ জানে না। প্রহরী তাহাকে তদবস্থায় নীরব থাকিতে দেখিয়া কহিল,—" পাগল নাকি! যাও, যাও, সরিয়া যাও—ভিতরে ঢুকিতে পাইবে না।"

এই অপ্রত্যাশিত বাধা পাইয়া হাফেজের হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। এ বাধা বিঘ্নের কথা ত সে স্বপ্নেও ভাবে নাই! হায়, তাহার বড় আশার ঘর নষ্ট হইবার উপক্রম হইল!

হাফেজ বলিল,—"আমি বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্যেই সাজাদার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছি। আমার সংবাদ পাইলে, তিনি আমাকে নিশ্চিত পুরস্কার দিবেন। তুমি ভয় পাইও না—আমায় পথ ছাড়িয়া দাও।"

প্র। পরওয়ানা না পাইলে আমি কাহাকেও ছাড়িয়া দিতে পারি না।

হা। আমার সংবাদ না পাইলে সাজাদার বিশেষ ক্ষতি হইবে —তোমাকে পরে নিশ্চয় তাহার জবাব দিতে হইবে।

প্র। সে ভার আমার —তোমার সে জন্য চিন্তা কেন? যাও, গোলমাল করিও না—সর।

হা। প্রহরি, আমি যাহা পুরস্কার পাইব, তাহার অর্দ্ধেক তোমার।

প্রহরী বড় ক্রুদ্ধ হইল। চীৎকার করিয়া কহিল,—"আরে কোথাকার বদ্‌মাইস্ ছোক্‌রা! খবরদার, ফের গোলমাল করিবে ত ধাক্কা দিয়া দূর করিয়া দিব। সাবধান!"

প্রহরী তরবারি ঘুরাইয়া হাফেজের নিকট অগ্রসর হইল। এমন সময় সেই স্থানে আর একটী লোক দ্রুতগতি উপস্থিত হইয়া কহিল,—"সবুর, সবুর, রহিম সেখ, হাতাহাতির প্রয়োজন নাই— আমি সব মীমাংসা করিয়া দিব। এ যুবক কে?"

প্র। কে জানে ভাই, কে? ছোক্‌রা বদ্ধ পাগল। পরওয়ানা নাই—জোর করিয়া বাড়ী প্রবেশ করিতে চায়।

আগন্তুক ভাল করিয়া একবার যুবকের মুখের দিকে তাকাইয়া কহিল,—"যুবক, তোমার নাম না হাফেজ?"

হাফেজ বিস্মিত হইয়া কহিল,—"হাঁ মহাশয়।"

আ। তুমি গৌড় হইতে আসিয়াছ?

হাফেজ আরও আশ্চর্য্য হইল। কহিল,—"আপনি কে?"

প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল,—"সে কি? চেন নাকি, রাজারাম?"

রাজারাম কহিল,—"হাঁ চিনিতে পারিয়াছি বৈ কি, ছাড়িয়া দাও—আমি উহাকে লইয়া যাইব।"

প্র। সে আমি কি করিয়া পারিব? আমার উপর যে তেমন হুকুম নাই।

রা। আমার সঙ্গে যাইবে—তবু হুকুম নাই?

প্র। তোমার পরওয়ানা আছে, তুমি যাইতে পার। উহার পরওয়ানা নাই, উহাকে ছাড়িব কেন?

রাজারাম কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। তার পর ঈষৎ রুষ্টস্বরে কহিল,—"রহিম, আমি যদি ইহার পরওয়ানা দেখাইতে পারি?"

প্র। পার বেশ ত, দেখাইয়া ভিতরে লইয়া যাও—আপত্তি করিব না।

রা। উত্তম—তোমার কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় বিশেষ প্রীত হইলাম। ভাল, এই দেখ দেখি, রহিম—এ পরওয়ানায় তুমি কতজন লোক আমার সঙ্গে ছাড়িয়া দিতে পার?

প্রহরী রাজারামের দিকে চাহিল। কিন্তু কোনও পরওয়ানা দেখিতে পাইল না, তৎপরিবর্ত্তে একটী উজ্জ্বল হীরকাঙ্গুরীয়ক তাহার চক্ষের সম্মুখে ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। প্রহরী বিস্মিত হইয়া রাজারামের হস্ত হইতে অঙ্গুরীয়ক গ্রহণ করিল—অন্ধকারের মধ্যে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল। অকস্মাৎ তাহার হস্তপদ অসার হইয়া গেল—দেহ কম্পিত হইল—মুখ শুকাইল। প্রহরী রাজারামের দিকে ভীত ও উৎকণ্ঠিত নেত্রে দৃষ্টিপাত করিল। তার পর ধীরে ধীরে অঙ্গুরীয়কটী রাজারামের হস্তে প্রত্যর্পণ করিয়া জানু পাতিয়া সেই স্থলে বসিয়া গেল! উপবেশনপূর্ব্বক

যোড়হস্তে কহিল,—“রাজরাজেশ্বর! গোলামের দণ্ডবিধান করুন!”

রাজারাম সহাস্যে সরিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন,—“সে কি রহিম সেখ! আমি যে রাজারাম সর্দ্দার!”

তার পর হাফেজের হস্তাকর্ষণ করিয়া প্রহরীকে দ্বিতীয় বাক্যব্যয়ের অবসরমাত্র না দিয়াই ভিতরে প্রবেশ করিল।

রাজারাম কে?

নবম পরিচ্ছেদ

সাজাদা বাহাদুর।

They hear forther than you think of.—Qeen Elizabeth.
Kenilworth.

উজ্জ্বল কক্ষমধ্যে উজ্জ্বল রজতাসনে বসিয়া সাজাদা বাহাদুর সাহ্ নর্ত্তকীগণের নৃত্যগীতে নিবিষ্ট ছিলেন। শতশত উজ্জ্বলদীপের উজ্জ্বল প্রভা সুন্দরীগণের অলঙ্কারে, বস্ত্রে ও কুটিল নয়নে বিক্ষিপ্ত হইয়া কক্ষের ভিতরে মুহুর্মুহু বিদ্যুদ্দামের সৃষ্টি করিতেছিল। সেই তড়িন্মালার সহিত রমণীগণের অলঙ্কারের মধুর নিক্কণ ও কলকণ্ঠের ললিত তরঙ্গ একত্র সুর বাঁধিয়া চারিদিকে কি অপূর্ব্ব মধুরতাই ছড়াইয়া দিতেছিল! এমন সময়ে সেই কক্ষমধ্যে উন্মুক্তদ্বারপথে অপর দুইটী প্রশান্ত মূর্ত্তি প্রবিষ্ট হইলেন। অগ্রগামী ব্যক্তির শিরোভূষণ সেই কক্ষের আলোকে ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। বাহাদুর দূর হইতে এই দৃশ্য দেখিতে পাইলেন, দেখিয়াই অকস্মাৎ

সিংহাসন ত্যাগপূর্ব্বক চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"মহারাজাধিরাজ বল্লালসেন!"

এই কথা উচ্চারিত হওয়া মাত্র চারিদিকে অকস্মাৎ একটা গোলযোগ বাঁধিয়া গেল। নর্ত্তকীগণ জানুপরি উপবিষ্ট হইয়া চারিদিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল—হাফেজ স্তম্ভিত হইয়া রাজারামের দিকে চাহিল। বাহাদুর সা পাদুকাবিহীন অবস্থাতেই দৌড়িয়া যাইয়া রাজারামকে কুর্ণিস করিলেন—নৃত্যগীত একেবারে থামিয়া গেল!

রাজারাম এই গোলযোগ লক্ষ্য করিয়া হাসিয়া কহিলেন, "না সাজাদা সাহেব,—মহারাজাধিরাজ নই—গরীবকে রাজারাম সর্দ্দার বলিয়াই জানিবেন!"

বাহাদুর উচ্চকণ্ঠে হাস্য করিয়া কহিলেন,—"ঠিক ঠিক, আমারই ভুল হইয়াছে—মহারাজাধিরাজ নন—আর্য্যপুত্র রাজারামই বটেন। আসুন তবে সর্দ্দার মহাশয়, আসুন, আসন পরিগ্রহ করুন। গরীবের আজ একান্ত সৌভাগ্য, তাই অযাচিত ভাবেই এতাদৃশ মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পাইয়া ধন্য হইলাম।"

তখন রাজারাম বা মহারাজাধিরাজ বল্লালসেন সেই রজতাসনে যাইয়া উপবিষ্ট হইলেন; তারপর বাহাদুরকেও টানিয়া লইয়া আপনার দক্ষিণপার্শ্বে বসাইলেন। সুবর্ণগ্রামাধিপতির ইঙ্গিতানুসারে হাফেজও যাইয়া নিম্নে একখানা আসন পরিগ্রহ করিল।

বাহাদুর তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহারাজ, এ যুবক কে?"

রাজারাম উত্তর করিলেন,—"বলিতেছি, কিন্তু তৎপূর্ব্বে আপনি রমণীগণকে গৃহান্তরে যাইতে আদেশ দিন্। অনেক গোপনীয় কথা আছে।"

বাহাদুর ইঙ্গিত করিলেন। নর্ত্তকীগণ বাহিরে প্রস্থান করিল। তখন বল্লালসেন কহিলেন,—"সাজাদা বাহাদুর, রাজ্যের খবর রাখেন কি? রাজ্যে যে অরাজকতা উপস্থিত!"

বাহাদুর হাসিয়া উত্তর করিলেন,—"বল্লালসেন জীবিত থাকিতে এ অরাজকতা কতক্ষণ থাকিবে?"

ব। না সাজাদা, আপনি যাহা মনে করিতেছেন, এ তাহা নহে—এ গোলযোগ নির্ব্বাণ করা আমার পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। সুবর্ণগ্রামে রমণীহরণ নিত্য-কার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বেণীপ্রসাদকে জানেন ত? আজ কতক দিবস হইল, সেই বেণী-প্রসাদের দুহিতাকে কে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। আবার দেখুন, তাহার একটা কুল কিনারা হইতে না হইতেই, এই বিদেশাগত দুর্ভাগ্য যুবকের ভগ্নিকেও কে বলপ্রয়োগে হরণ করিয়াছে!

বল্লালসেন হাফেজকে দেখাইয়া দিলেন। বাহাদুর আশ্চর্য্য হইয়া হাফেজের দিকে চাহিয়া উৎসুক্যপূর্ণকণ্ঠে কহিলেন,—"যুবক তোমারই নাম কি হাফেজ?"

বল্লাল ও হাফেজ উভয়েই বিস্মিত হইলেন। হাফেজ দেখিল, সে সকলেরই পরিচিত! সে ভাবিল, একি ইন্দ্রজাল? উত্তর করিল, "হাঁ সাজাদা, গোলামের নামই হাফেজ বটে।"

বা। তুমিই গৌড় হইতে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলে?"

ব। সে কি সাজাদা? আপনিও ইহাকে চিনেন নাকি?

বাহাদুর হাসিয়া উত্তর করিলেন,—"হাঁ মহারাজ, গরীব কেবল নৃত্যগীতেই সময় অতিবাহিত করে না—রাজ্যের খবরাখবরও কিছু সংগ্রহ করে।"

বল্লাল আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, "ধন্য সাজাদা, আপনিই ধন্য! আপনি যথার্থই বঙ্গেশ্বর হইবার উপযুক্ত ব্যক্তি।—বঙ্গের সিংহাসন একদিন আপনারই হইবে। তবে আপনি পদ্মাবতী-হরণের কথাও অবগত আছেন?

বা। হাঁ মহারাজ, সে কথাও অবগত আছি। আরও জানি যে, সে ভাগ্যবতী সুবর্ণগ্রামাধিপতিকেও মুগ্ধ করিয়াছিল।

ব। সাজাদা, আপনি সাক্ষাৎ দেবতা, অন্তর্যামী!

বা। না মহারাজ, এ গোলাম দেবতার গোলামের গোলাম সামান্য মানব মাত্র। তার সাক্ষী দেখুন, আমি এখনও একটা কথা জানিতে পারি নাই।

ব। সে কি কথা, সাজাদা?

বা। এই যুবক ও ইহার ভগিনী গৌড় হইতে আমারই সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল। আমি ইহাও শুনিয়াছি যে, যে সংবাদ দিবার জন্য ইহারা আসিয়াছিল, সেই সংবাদ এই যুবকের অজ্ঞাত—ইহার ভগিনীই সে সংবাদ জানে। কিন্তু দৈববশে সে ভগ্নি এখন দস্যু-করে বন্দিনী। আমি এখনো জানিতে পারি নাই, সে সংবাদ কি?

হাফেজ এই কথা শুনিয়া উঠিয়া অতি বিনীত ভাবে নিবেদন করিল, "সাজাদা, সে সংবাদের সঙ্গে আপনার স্বার্থ বিশেষ ভাবে জড়িত আছে। আমি সে সংবাদ জ্ঞাপন করিতেই সাজাদার দর্শন-প্রার্থী হইয়া এখানে আসিয়াছি।"

বা। সে কি? তুমিও কি তবে সে কথা অবগত আছ?

হা। না সাজাদা, সাজাদা বাহাদুর সাহের প্রাপ্ত সংবাদ

অলীক নহে—আমি সে সংবাদ সম্পূর্ণ অবগত নই। ফতেমা বিশ্বাস করিয়া আমাকেও সে কথা কহে নাই।

ব। তবে তুমি কি কথা আমাকে জানাইতে আসিয়াছ ?

হা। কিন্তু সে সংবাদ কি বিষয়ে, তাহা আমি অবগত আছি। তাহা জ্ঞাপন করিলে সাজাদার চেষ্টায় যদি ফতেমার কোনও অনুসন্ধান হয়, সেই ভরসায়ই আজ আমি সাজাদাকে জানাইতে আসিয়াছি যে, ফতেমা দৌলৎউন্নিসার সংবাদ লইয়া আসিয়াছিল।

বাহাদুর অকস্মাৎ লাফাইয়া উঠিলেন। কহিলেন,—"দৌলৎ-উন্নিসা!—দৌলৎউন্নিসার সংবাদ লইয়া আসিয়াছিল!"

হা। হাঁ সাজাদা।

বা। কোন্ দৌলৎউন্নিসা, হাফেজ ?

হা। নবাব-পৌত্রী দৌলৎউন্নিসা।

বাহাদুর বড় উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন—অনেকক্ষণ শব্দ করিলেন না। তারপর গভীর চিন্তার পরে কহিলেন, "ভাল, আর কিছুই কি তুমি অবগত নও ?

হা। না সাজাদা আর কিছুই আমি অবগত নই। তবে সে সম্বন্ধে আর এইমাত্র জানি যে, সেই দৌলৎউন্নিসাকে হস্তগত করিবার জন্য গৌড়েশ্বরও বিশেষ লালায়িত। কেবল তাঁহার খবর পাইতেছেন না বলিয়াই এখনও তাঁহাকে হস্তগত করিতে পারেন নাই। নাসিরুদ্দীন বাদসা সাজাদাকেই দৌলৎউন্নিসা প্রদান করিতে ইচ্ছুক। কিন্তু সাজাদার ভয়ে নিজ হইতে অগ্রসর হইয়া সাজাদাকে মনোভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া বলিতে পারিতেছেন না। তিনি এখন দৌহিত্রীসহ কোন এক অজ্ঞাত স্থানে বাস করিতেছেন। সে স্থান ফতেমা ভিন্ন অপর কেহই অবগত নহে। সেই ফতেমা সেই

দৌলৎ উন্নিসাকে সাজাদার নিকট উপস্থিত করিয়া দিবে বলিয়াই সুবর্ণগ্রামে আসিয়াছিল। যদি সাজাদা নাসিরুদ্দীনের অনিষ্ট করিতে বিরত থাকিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেন, এবং এই দৈব দুর্ঘটনা না ঘটিত, তবে এতদিন দৌলৎউন্নিসা সুবর্ণগ্রামে উপস্থিত হইত। সাজাদা, ফতেমার অনুসন্ধান করুন—নবাবপৌত্রীর উদ্ধারের জন্য ফতেমার উদ্দেশ করুন—আমার ভগ্নিকে উদ্ধার করুন।

বল্লালসেন আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সাজাদা, গৌড়েশ্বর নাসিরুদ্দীন কি এখনও জীবিত?"

বাহাদুর বড় চিন্তা মগ্ন। অন্যমনস্ক ভাবে কহিলেন, "হা মহারাজা, সে রূপই শুনিতে পাইতেছি বটে। কিন্তু আসুন, আমার সঙ্গে আসুন, এস্থান তেমন নিরাপদ নহে। ভিতরে যাইয়া বিশেষ পরামর্শ করা যাইবে।"

তখন সকলে মিলিয়া বাহাদুরের খাসমহলে প্রবেশ করিলেন। বাহাদুরের বিবাহ হয় নাই, সুতরাং অন্দর ছিল না।

দশম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

আগন্তুক।

I'll go, my chief—I'm ready :
It is not for your silver bright ;
But for your winsome lady :
Campbell.

যখন বাহাদুরের আলায়ে এই ব্যাপার, তখন অন্যদিকে আর একটা অদ্ভুত অভিনয় চলিতেছিল।

হাফেজ চলিয়া গেলে, বেণীপ্রসাদ সান্ধ্যকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক বাহিরে উপবেশন করিয়া আকাশের শোভা দেখিতেছিলেন, এমন সময় সে স্থানে একজন অপরিচিত লোক আসিয়া দাঁড়াইল। আগন্তুকের বলিষ্ঠ গঠন, উন্নত দেহ, তীক্ষ্ণদৃষ্টি। বেণীপ্রসাদ তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কে?"

আ। আমার নাম কিষণলাল।

বেণী। কোথায় আসিয়াছ?

আ। মহাশয়েরই সমীপে আসিয়াছি।

বেণী। কি প্রয়োজন?

আ। আমি বড় বিপদগ্রস্ত।

বেণী। কাহারও অসুখ হইয়াছে বুঝি?

আ। আপনি যথার্থ অনুমান করিয়াছেন।

বেণী। কিন্তু আমি এখন সন্ন্যাসী—ব্যবসা বন্ধ করিয়াছি।

আ। দয়া করিয়া আজ আমায় উপকার না করিলে আমার সর্ব্বনাশ হয়।

বেণী। দেখ, সংসারের কোলাহল পরিত্যাগ করিবার জন্যই আমি সকল ছাড়িয়া এ নির্জ্জন স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি—আর সংসারের কথা কাণে তুলিতে চাই না।

আ। মহাশয়, বিশ্ব-বাসীর দুঃখ-কষ্ট দূর করাই না ত্যাগীদিগের কর্ত্তব্য?

বেণী। তুমি অন্যত্র যাও না। সুবর্ণগ্রামে শত শত বৈদ্য আছেন, যে কেহ তোমার সাহায্য করিতে পারিবেন।

আ। এ পীড়িতকে আরোগ্য করা বেণীপ্রসাদ ভিন্ন অপর কাহারও সাধ্য নহে।

বেণী। বটে? কি পীড়া?

আ। বিষপানে আত্মহত্যা!

বেণী। বিষপান! আত্মহত্যা! যে মৃত সে কি করিয়া পুনর্জ্জীবিত হইবে?

আ। বেণীপ্রসাদ কৃপা করিলে, এরূপ মৃত আরোগ্য হইতে পারে।

বেণীপ্রসাদ অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন। তারপর কহিলেন, "কতক্ষণ বিষ খাইয়াছে?"

আ। এক রাত্রি, এক দিন।

বেণী। রোগী, পুরুষ না রমণী?

আ। রমণী।

বেণী। বয়স কত?

আ। পনর, ষোল।

বেণীপ্রসাদ আবার কতক্ষণ কি চিন্তা করিলেন। তাহার পর কহিলেন, "তোমার ঘর এখান হইতে কতদূর?"

আ। দুই প্রহরের পথ হইবে।

বেণী। দুইপ্রহর! অসম্ভব—আমার তত চলিবার ক্ষমতা নাই যে।

আ। সেজন্য চিন্তিত হইবেন না। হাঁটিয়া যাইতে হইবে না—আমি নৌকার বন্দোবস্ত করিয়াছি।

বেণীপ্রসাদ আবার চিন্তা করিলেন। তারপর কহিলেন, "ভাল, এখনিই কি যাইতে হইবে?"

আ। এখনই।

বেণীপ্রসাদ অগত্যা স্বীকৃত হইলেন। তখন সেই অপরিচিত

ব্যক্তি তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। উভয়ে নদীতীরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

চিকিৎসক ও পীড়িতা।

Who knows—who knows what seas
He is now careering o'er?

Moore.

কিন্তু নৌকায় উঠিয়া সেই অপরিচিত ব্যক্তি একটা বড় অদ্ভুত কার্য্য করিল—জোর করিয়া বেণীপ্রসাদের চক্ষুদুটী একটী চাদর দিয়া অকস্মাৎ বাঁধিয়া দিল। বেণীপ্রসাদ আশ্চর্য্য ও ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "ওকি করিলে ?"

আ। ক্ষমা করুন, কোথায় লইয়া যাইতেছি, সে কথা আপনি জানিতে পারিবেন না—তাই এ ব্যবস্থা করিলাম। এই অবস্থায়ই আবার আপনাকে এইস্থানে আনিয়া ফিরাইয়া দিয়া যাইব।

বেণীপ্রসাদ এই উত্তর শুনিয়া যেমনি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, তেমনি ভীতও হইলেন। কহিলেন,—"তোমার ব্যবহার দেখিয়া বোধ হইতেছে, একটা কিছু বিষম ব্যাপারে আমায় জড়াইবার চেষ্টা পাইতেছ। আসিয়া ভাল করি নাই।"

আ। ভাল করিয়াছেন কি মন্দ করিয়াছেন, সে বিচারে এখন প্রয়োজন কি ? যখন আসিয়াছেন তখন চুপ করিয়া থাকুন—

আপনার কিছুমাত্র আশঙ্কার কারণ নাই। কিন্তু একটা কথা মনে রাখিবেন, এখন আপনি আমাদের হাতে—অবাধ্যতা প্রকাশ করিলে বিপদ ঘটিতে পারে।

বেণীপ্রসাদ তাহার অবস্থা কতক কতক বুঝিতে পারিলেন। মনে মনে কহিলেন,"ভাল, সুবর্ণগ্রামে একি হইল ?" কিন্তু প্রকাশ্যে আর বাক্যব্যয় করিলেন না,চুপ করিয়া ভবিষ্যৎ দেখিবার প্রতীক্ষায় শয়ন করিয়া সময় কাটাইতে লাগিলেন। রাত্রি আড়াই প্রহর অতীত হইলে নৌকা আসিয়া গন্তব্য স্থানে পৌছিল। বেণীপ্রসাদ নৌকায় থাকিয়াই তীরে লৌহকবাট উন্মোচনের শব্দ শুনিতে পাইলেন। যেন কোন বিপুল ধনাগারের বজ্রকঠিন দ্বার সহসা বজ্রধ্বনিতে উন্মুক্ত হইয়া গেল। বেণীপ্রসাদ অনুভবে বুঝিলেন, তাহাদের নৌকা কোন একটী সলিলচুম্বিত অট্টালিকার দ্বারদেশে আসিয়া লাগিয়াছে। নৌকা তীরে ভিড়িলে তাঁহার বোধ হইল, যেন আরও দু'চারিজন নূতন লোক আসিয়া সেই পূর্ব্বোক্ত লোকটীর সঙ্গে অনুচ্চস্বরে কি বাক্যালাপ করিল। কিন্তু তাহাদের স্বর এত আস্তে উচ্চারিত হইতেছিল যে, বেণীপ্রসাদ তাহার এক বর্ণও বুঝিতে পারিলেন না।

কতকক্ষণ পরে সেই লোকটী বেণীপ্রসাদকে তীরে উঠিতে অনুরোধ করিল। বেণীপ্রসাদ তাহার হস্ত ধারণ করিয়া তীরে উঠিলেন। পাষাণ নির্ম্মিত তীর—হস্তানুভবে বুঝিলেন, নৌকা একবারে আসিয়া একটী বৃহৎ পাষাণগঠিত প্রাচীরের গায় ঘেসিয়া দাঁড়াইয়াছে। নৌকা হইতে নামিয়াই তাঁহারা সেই প্রাচীরের দ্বার অতিক্রম করিলেন। দ্বার অতিক্রম করিলে, সেই লোকটী তাহাকে হাতে ধরিয়া সিঁড়ি বহিয়া উপরে উঠাইতে লাগিল। বেণীপ্রসাদের বোধ

হইল, তাহারা অন্যূন ত্রিশ পঁয়ত্রিশটী ধাপ অতিক্রম করিয়া উপরে উঠিলেন। তারপর আবার তাহাদিগকে আর এক শ্রেণী সিঁড়ি বহিয়া নীচে নামিতে হইল। তারপর তাহারা অনেক দূর পর্য্যন্ত সমতল ভূমির উপর দিয়া চলিলেন। এইভাবে তাহারা অনেকদূর গেলেন—অনেক গৃহ, প্রাঙ্গণ, সোপান, দ্বার প্রভৃতি পার হইয়া প্রায় অর্দ্ধ দণ্ড পরে তাহারা একটী স্থলে উপনীত হইলেন। সেইখানে আবার একটী সুবৃহৎ লৌহ দ্বারোন্মোচনের শব্দ শ্রুত হইল। আবার কাহার সহিত সেই অপরিচিত ব্যক্তির অনুচ্চস্বরে বাক্যালাপ হইল। আবার তাহারা আর একটী লৌহদ্বার অতিক্রম করিলেন। এইখান হইতে তাহাদিগকে আবার সোপান শ্রেণী বহিয়া খানিকটা নীচে অবতরণ করিতে হইল। তারপর সেই লোকটী আরও কতকগুলি ঘর, দ্বার, অতিক্রম করিয়া অবশেষে একটী ঘরে প্রবিষ্ট হইয়া কহিল,—"বন্ধন মোচন করুন। আমরা গন্তব্যস্থানে আসিয়াছি।"

বেণীপ্রসাদ এতক্ষণ নানারূপ চিন্তা ভাবনায় অস্থির হইয়া উঠিতে ছিলেন, এখন হঠাৎ অনুমতি পাইয়া অকস্মাৎ চক্ষের বাঁধন মুক্ত করিলেন। বেণীপ্রসাদ কি দেখিতে পাইলেন? বেণীপ্রসাদ দেখিলেন, তিনি একটী অতি সুসজ্জিত, গৃহে আনীত হইয়াছেন। গৃহের চারিদিকে বহুমূল্য শিল্পদ্রব্যাদি সজ্জিত রহিয়াছে। ঘরের মেজেতে মর্ম্মর প্রস্তর, দেয়ালে নানাবিধ চিত্র, চারিদিকে মূল্যবান বসিবার আসন ও একপার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র পালঙ্কাদি। সেই পালঙ্কোপরি শুভ্রবস্ত্রাবৃত কি একটী পদার্থ! বেণীপ্রসাদ বুঝিলেন, এ সেই শবদেহ। ঘরটী তেমন বৃহৎ নয়; ঘরের এককোণে একটী প্রস্তর বেদীর উপরে সুন্দর সুগন্ধি প্রদীপ জ্বলিতেছে—সেই প্রদীপের আলোতে চারিদিক

উদ্ভাসিত। বেণীপ্রসাদ কোথায় আসিলেন, কি করিলেন, কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া অবাক্ হইয়া চারিদিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অপরিচিত ব্যক্তি তাহার এই অবস্থা দেখিয়া হাসিয়া কহিল,—"কি দেখিতেছেন? এই পালঙ্কোপরিই আপনার রোগী শয়ানা রহিয়াছে—দেখিয়া যথাবিহিত ব্যবস্থা করুন। রোগীর ব্যবস্থা হইবা মাত্র পুনঃ আপনাকে এই স্থান পরিত্যাগ করিতে হইবে।"

বেণীপ্রসাদ কহিলেন,—"তাহাতে আমার বিন্দুমাত্রও আপত্তি নাই। এখনও যে আমাকে এস্থানে থাকিতে হইতেছে, ইহাই পরিতাপের বিষয় ও দুর্ভাগ্য!

আ। ভাল, ভাল, দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য তাহা অবিলম্বেই প্রমাণিত হইবে। শবের বস্ত্র উন্মোচন করুন।

বেণীপ্রসাদ তাহার বাক্য ও স্বর শুনিয়া আরও বিস্মিত হইলেন; ধীরে ধীরে যাইয়া পালঙ্কে বসিয়া শবের বস্ত্র উন্মোচন করিলেন। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তাঁহার মুখ হইতে একটা অস্পষ্ট চীৎকারধ্বনি নির্গত হইয়া গেল। বেণীপ্রসাদ ভীত—স্তব্ধ—উদ্বেলিত! বেণী-প্রসাদ কি দেখিতেছেন? বেণীপ্রসাদ তাহার চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। দেখিলেন; সে রমণী আর কেহ নহে, তাঁহারই চিরস্নেহাস্পদা, চিরপালিতা পদ্মাবতী!

বেণীপ্রসাদ কতক্ষণ জড়পদার্থবৎ হইয়া নিশ্চল রহিলেন; তার-পর অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। ক্রোধে অধর দংশন করিয়া অপরিচিতকে সম্বোধন পূর্ব্বক তিনি কহিলেন,—"তস্কর, কে তুমি?"

অপরিচিত রাগিল না। পরন্তু হাসিয়া উত্তর করিল,—"বৃদ্ধ, ধৈর্য্য হারাইও না—এ আস্ফালনের স্থান নয়। পদ্মাবতী এখন

আমার—তাহাকে মুক্ত করিবার তোমার আর এখন বিন্দুমাত্রও শক্তি নাই। এখন কাজের কথা শোন। কন্যা নিজহস্তে বিষপান করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে—তুমি এখন পিতা হইয়া, যদি ইচ্ছা হয়, তাহার প্রাণদান কর—আর ইচ্ছা না হয় এই দণ্ডে এইস্থান পরিত্যাগ করিয়া যথা ইচ্ছা চলিয়া যাও—আমার তাহাতে বিন্দুমাত্রও আপত্তি নাই।”

বেণীপ্রসাদ ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন,—“উত্তম। পদ্মাবতী বিষ খাইয়াছে, ভালই করিয়াছে। সে আমার উপযুক্ত দুহিতা—তাই অতি বুদ্ধিমতীর মত এই কার্য্য করিয়াছে—আমি আর তাহাকে কুক্কুরের পদসেবা করিবার জন্য পুনর্জ্জীবিত করিব না। আমি এক্ষণেই এস্থান পরিত্যাগ করিতেছি।”

অপরিচিত ব্যক্তি বেণীপ্রসাদ হইতে এ উত্তরের আশা করে নাই। এখন বেণীপ্রসাদকে যাইতে উদ্যত দেখিয়া কহিল,— “কিন্তু বৈদ্যরাজ, মুক্তচক্ষু হইয়া আপনি এ স্থান পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। আমি আবার আপনাকে বাঁধিয়া এস্থান হইতে লইয়া যাইব। কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে আর একবার চিন্তা করিয়া দেখুন—ইহাই কি কর্ত্তব্য?”

এখন চক্ষু বাঁধিবার কথায় বেণী প্রসাদের মনে একটা দুঃসাহসিক কল্পনা জাগিয়া উঠিল। বেণীপ্রসাদ ভাবিলেন, ভাল, এই চোখের বাঁধনটা কি? যাইবার কালে একবার এটা টানিয়া ফেলিয়া দিয়া জায়গাটা চিনিয়া গেলে হয় না? তার পর একবার মুক্ত হইতে পারিলে দেখা যাইতে পারে, এ তস্কর কে!

বেণীপ্রসাদ ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহা দেখিয়া সেই ব্যক্তি কহিল, “ভাল, চিন্তা করিতে হয়, আপনাকে অর্দ্ধদণ্ড সময় দিলাম

ভালরূপ চিন্তা করিয়া দেখুন। মনে রাখিবেন, পদ্মাবতীর উপর অত্যাচার করিবার বাসনায় আমি তাহাকে এখানে আনি নাই, তাহাকে রাজরাণী করিব বলিয়াই আনিয়াছি। বাঁচিয়া থাকিলে সে কথা আপনিও একদিন প্রত্যক্ষ দেখিতে পারিবেন। আমি অর্দ্ধদণ্ড পরে আবার ফিরিয়া আসিতেছি, সেই সময়ে আপনার শেষ উত্তর চাই।"

এই বলিয়া সেই ব্যক্তি চলিয়া গেল। বেণীপ্রসাদ সঙ্কল্প পূর্ব্বেই এক প্রকার স্থিরীকৃত করিয়াছিলেন, এখন পদ্মাবতীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একবার ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। তাহার মুখ কিঞ্চিৎ হর্ষপ্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

অর্দ্ধদণ্ড অতিবাহিত হইলে, সেই অপরিচিত ব্যক্তি যখন আবার ফিরিয়া আসিল, তখন বেণীপ্রসাদ স্থির, ধীর, বদ্ধপরিকর। অপরিচিত জিজ্ঞাসা করিল, "কি? কি স্থির করিলেন?"

বেণীপ্রসাদ কহিলেন, "আমি ঔষধ বাহির করিয়া রাখিয়াছি—প্রস্তুত করিবে কে?"

অ। সেজন্য চিন্তা নাই—আমি নিজে করিব। উপদেশ দিন

তখন বেণীপ্রসাদ লোকটীর হাতে কতকগুলি ঔষধ প্রদান পূর্ব্বক যথারীতি উপদেশপ্রদানান্তর কহিলেন,—"এই কয়টী ঔষধ পর পর সেবন করাইলেই রজনীপ্রভাতের পূর্ব্বে বিষক্ষয় হইবে। তার পর আরও দুই চারিবার ঔষধ প্রদান করিলে চৈতন্য ফিরিয়া আসিবে। চেতনা সঞ্চার হইলে আরও একদিন যথারীতি ঔষধ দিবে। তবেই আর কোনও আশঙ্কার কারণ থাকিবে না।"

যথারীতি ঔষধ ও উপদেশ প্রদান সমাপ্ত হইলে, বেণীপ্রসাদ যাইবার জন্য গাত্রোত্থান করিলেন। লোকটা আবার তাঁহার

চক্ষু বাঁধিয়া দিয়া, হাতে ধরিয়া লইয়া চলিল। আবার নানা কক্ষ, প্রাঙ্গণ ও গৃহদ্বার অতিক্রম করিয়া আসিয়া উভয়ে সমভূমিতে উপনীত হইলেন। এইখানে পৌছিয়াই বেণীপ্রসাদ আপনার উদ্দেশ্য'সিদ্ধির সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে বড় কঠিন ব্যাপার—লোকটা বিশেষ সতর্কতার সহিতই তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতে ছিল। একটুমাত্র অবাধ্যতা সে ব্যক্তির নয়নগোচর হইলে, তিনি যে বিশেষ বিপদাপন্ন হইবেন—একথা বেণীপ্রসাদের বুঝিতে বাকী রহিল না। কিন্তু বেণীপ্রসাদ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ!—যেরূপে হউক তাঁহাকে একবার স্থানটার পরিচয় লইতেই হইবে। তিনি ভাবিতে ভাবিতে নীরবে চলিতে লাগিলেন।

এইরূপ ভাবে অনেকদুর যাইয়া তাঁহারা এক শ্রেণী সোপান আরোহণ করিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন। সেই উচ্চস্থানে আরোহণ করিলে তাঁহাদের পদতলে নীচে গভীর জলকল্লোল শ্রুত হইল। বেণীপ্রসাদ বুঝিতে পারিলেন, তাহারা নদীকুল-সমাগত হইয়াছেন। আর অপেক্ষা করা সঙ্গত নহে, আর অপেক্ষা করিবার উপায় নাই—বেণীপ্রসাদ হঠাৎ একটা কাজ করিলেন। চলিতে চলিতে অকস্মাৎ একস্থানে ইচ্ছাপূর্ব্বক আছাড় খাইয়া পড়িলেন। তার পরই "উঃ! হুঁ হুঁ! গেলাম—গেলাম" রবে চীৎকারধ্বনি করিয়া নিমেষে চক্ষের বাঁধন মুক্ত করিয়া ফেলিলেন। এক মুহূর্ত্তে বেণীপ্রসাদ চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। তিনি দেখিলেন, সেই গভীর নিশীথে তিনি এক বিরাটরাক্ষসীমূর্ত্তি দুর্গপ্রকারোপরি উপবিষ্ট আছেন; আর সেই দুর্গের মূলদেশ ক্ষয়িত করিয়া 'কুলুকুলু'নাদিনী তরঙ্গিনী খর-স্রোতে বহিয়া যাইতেছে। চারিদিক তমসামণ্ডিত;—সেই তমসা

পরিধান করিয়া দুর্গের ভীমকায় তুঙ্গ শৃঙ্গ তারকার ক্ষীণ আলোকে নৈশাকাশে হিমাদ্রি-শিখরবৎ সগর্ব্বে দাঁড়াইয়া আছে।—যেন কোন কৃষ্ণকায় প্রকাণ্ড দৈত্য বিশ্বগ্রাস করিবার অভিপ্রায়ে গ্রীবা উন্নত করিয়া চারিদিকে লক্ষ্য করিতেছে। কক্ষ কক্ষান্তর হইতে দু' একটী উজ্জ্বল আলোক সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া তাহার আরক্ত লোচনবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। নীচে তরঙ্গিনী-বক্ষ বীচিমালা বিলোড়িত—তাহাতে ইতস্ততঃ দু'একটী ক্ষুদ্র তরণী নাচিতেছে। সেই তরণীগুলির কোন একটী হইতে একটী ক্ষুদ্র দীপরশ্মি। বহির্গত হইয়া তরঙ্গে তরঙ্গে প্রতিবিম্ব ছড়াইতেছে। এক মুহূর্ত্তে বেণীপ্রসাদ এই সকল দেখিয়া লইলেন। কিন্তু সেই এক মুহূর্ত্ত অতীত হইতে না হইতেই তাঁহার পথ-প্রদর্শক ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত তাঁহার উপর আসিয়া পড়িল। ভীষণ গর্জ্জন করিয়া সেই ব্যক্তি কহিল,—"দুর্ব্বুদ্ধি বৃদ্ধ, প্রতারণা করিয়া আমায় ঠকাইবে ভাবিতেছ?—এখন কর্ম্মানুযায়ী ফল ভোগ করিতে প্রস্তুত হও।"

এই কথা কহিয়া সেই ব্যক্তি এক ধাক্কায় বেণীপ্রসাদকে প্রাচীর হইতে নীচে নিক্ষেপ করিল। প্রাচীর নদীগর্ভ হইতে ঠিক লম্বভাবে আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছিল। বেণীপ্রসাদ চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কিন্তু সেই চীৎকারধ্বনি আকাশে মিলাইতে না মিলাইতেই তাঁহার দেহ তরঙ্গিনীস্রোতে নিক্ষিপ্ত হইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল!

ইহার পরে সেই পাপিষ্ঠ নিক্ষেপকারী কতক্ষণ পর্য্যন্ত সেইস্থানে দাঁড়াইয়া, যেখানে জলরাশি বড় বিক্ষিপ্ত ও আন্দোলিত হইতেছিল, সেই দিকে চাহিয়া রহিল; তারপর বৃদ্ধের অবধারিত মৃত্যু মনে মনে সিদ্ধান্ত করিয়া গৃহে ফিরিয়া গেল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

আঁধারে আলোক।

Oh ! May he come in happy hour
My drooping soul to cheer !

Mrs. Hunter.

বেণীপ্রসাদ পড়িবামাত্রই অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। যখন পুনরায় তাঁহার চেতনা হইল, তখন তিনি দেখিলেন, তিনি কাহার কুটীরে আশ্রয় পাইয়াছেন। কুটীরস্বামী তাঁহার নিকটেই বসিয়া শুশ্রূষা করিতেছে। তিনি অতি কষ্টে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ আমি কোথায় আসিয়াছি ?"

বৃদ্ধ কুটীরস্বামী তাঁহাকে কথা কহিতে দেখিয়া আনন্দিত হইয়া সোৎসুকে বলিয়া উঠিল, "জয় মা দুর্গা, তবে তুমি বাঁচিয়া উঠিলে—আমার শ্রম সফল হইল। আমি তোমায় নদীগর্ভ হইতে অতি যত্নে তুলিয়া আনিয়া প্রাণপণ করিয়াছি।" বেণীপ্রসাদ আবার ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কে ?"

কুটীরস্বামী। আমি গরীব দুঃখী লোক--নৌকার মাঝি।

বেণী। আমি কতক্ষণ এইখানে আছি ?

মা। আজ পাঁচদিন তোমায় এখানে আনিয়াছি।

বেণী। পাঁচ দিন !

বেণীপ্রসাদের মুখ শুকাইয়া গেল। স্বহস্তে স্বহস্তের নাড়ী পরীক্ষা করিয়া তিনি কহিলেন,—"মাঝি, তুমি আমার যথেষ্ট

উপকার করিয়াছ, কিন্তু তবু বাঁচাইতে পারিলে না। কিন্তু আমি যে আবার একটী কথাও বলিয়া যাইবার অবসর পাইয়াছি, এই আমার ঢের—এ ঋণ আমি তোমার পরিশোধ করিতে পারিব না। মাঝি, আমার সময় নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছে—হয়ত আর দু'দিনের বেশী এ সংসারে থাকিব না। যদি এত করিয়াছ, শেষ কালে আমার আর একটী কাজ করিবে?"

মাঝি কহিল, "সে কি মহাশয়—আপনি যে ভাল হইয়া উঠিতেছেন!"

বেণীপ্রসাদ হাসিলেন। কহিলেন,—"বৃদ্ধ, আমার নাম বেণীপ্রসাদ—বেণীপ্রসাদ মরণবাচনের দ্বন্দ্ব মীমাংসা করিয়া চুল পাকাইয়াছে, তাহার কথায় অবিশ্বাস করিও না।"

মাঝি আকাশ হইতে পড়িল। চীৎকার করিয়া কহিল,— "বল কিগো—তুমি বেণীপ্রসাদ!"

বে। হাঁ, আশ্চর্য্য হইও না। এখন সময় নষ্ট করিবার সময় নহে—আমার সময় বড় সংক্ষেপ। এখন প্রথমে আমার একটা কথার উত্তর দেও। তুমি যে স্থলে আমায় পাইয়াছিলে, তাহার অনতিদূরেই একটা বৃহৎ প্রস্তর নির্ম্মিত দুর্গ আছে। সে দুর্গের নাম কি বলিতে পার?

মা। তুমি কি একডালা কেল্লার কথা কহিতেছ?

বে। একডালা! একডালা! আমি কি তবে একডালা দুর্গে গিয়াছিলাম?

মা। আর ত এদিকে অপর কেল্লা নাই।

বেণীপ্রসাদের হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—একডালা? কি সর্ব্বনাশ! এ রাক্ষসীদুর্গ ত বাহাদুরের

হাতে! তবে কি বাহাদুরই এ কাণ্ড করিতেছেন? তাহা হইলে উপায়? বাহাদুরের বিরুদ্ধে সুবর্ণগ্রামে কে কথা কহিবে? কিন্তু তাই বা কি করিয়া হয়? যে ব্যক্তি পদ্মাবতীকে হস্তগত করিয়াছে, সে ত দেখিলাম হিন্দু! কিন্তু এ হিন্দু যদি বাহাদুরেরই জন্য একার্য্য করিয়া থাকে? হাঁ, সে তাহাকে ত স্পষ্টই বলিয়াছে, পদ্মাকে রাজরাণী করিবে বলিয়াই সে হরণ করিয়াছে। বাহাদুরই ত দেশের প্রকৃত রাজা। তবে নিশ্চয়ই কি বাহাদুর এ কাজ করিলেন!

ভাবিতে ভাবিতে বেণীপ্রসাদ চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। মাঝি জিজ্ঞাসা করিল,—"মহাশয়, আর কিছু আজ্ঞা করিবে কি?"

বেণীপ্রসাদ চক্ষু মেলিলেন। আবার কিছু চিন্তা করিয়া দেখিলেন। তার পর আবার চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। তার পর অনেকক্ষণ পরে কহিলেন,—"তুমি একবার সুবর্ণগ্রামে যাইতে পারিবে?"

মা। প্রয়োজন হইলে পারিব না কেন মহাশয়?—অবশ্য পারিব।

বেণী। এখনই?

মা। এখনই।

বেণী। ভাল তবে এখনই রওয়ানা হও—আমার সময় নিকটবর্ত্তী, আমার বাক্য বন্ধ হইতে না হইতে ফিরিয়া আসা চাই। সেখানে যাইয়া বেণীপ্রসাদের আশ্রম অনুসন্ধান করিও। বাড়ী ছাড়িয়া আমি আজকাল নগরের বাহিরে কোনও আশ্রমে আশ্রয় লইয়াছিলাম—সেই আশ্রমে 'হাফেজ' বলিয়া একটী যুবকের দেখা পাইবে। তাহাকে সকল কথা কহিয়া অবিলম্বে এইখানে লইয়া আসিবে।

মাঝির যেমন কথা, তেমনি কাজ। সে তখনই বিদায় হইল। মাঝি চলিয়া গেলে, মাঝির বৃদ্ধা স্ত্রী ও পুত্রকন্যাগণ আসিয়া তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

পরদিন প্রত্যুষেই হাফেজ আসিয়া উপস্থিত। তখন বেণী-প্রসাদের অবস্থা বড় শোচনীয়। মুখ দিয়া ভাল করিয়া কথা সরি-তেছে না—কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। হাফেজ অতি কষ্টে তাঁহার নিকট হইতে পদ্মাবতীর কাহিনী জানিয়া লইল। অতি কষ্টে কথা শেষ করিয়া বেণীপ্রসাদ হাফেজের নিকট হইতে শেষ বিদায়গ্রহণ করিলেন। কহিলেন,—"বৎস, আমি চলিলাম—পদ্মাবতীর ভারও তোমার উপরেই রহিল। এই সূত্র ধরিয়া চেষ্টা কর—পদ্মাবতীর সঙ্গে সঙ্গে ফতেমারও নিশ্চিত সন্ধান পাইবে। বিজয়চাঁদকে এ সংবাদ দিও—মহারাজ বল্লালসেনকেও এ সংবাদ জানাইও। আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর!"

বেণীপ্রসাদ চলিয়া গেলেন। হাফেজ গ্রামবাসিগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহার সৎকার করাইয়া অবিলম্বেই সুবর্ণগ্রামে পৌছিয়া বেণীপ্রসাদের নির্দ্দেশানুযায়ী কার্য্য করিল। হাফেজ বড় বিস্মিত হইল—বাহাদুরের দুর্গে এই কাণ্ড! কিন্তু হাফেজ কথাটা বিশ্বাস করিল না। বাহাদুরও একথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার বিস্ময় শীঘ্রই ক্রোধে পরিণত হইল। বল্লাল ও বাহাদুর পরামর্শ করিতে লাগিলেন। বিজয় বুঝিলেন, এইবার পদ্মাবতীর উদ্ধার সাধিত হইবে। তিনি আশ্বস্ত হইয়া এখন একটু নিজকে অন্তরালে নিক্ষিপ্ত করিলেন।

কথাটা সাধারণের নিকট গোপন রহিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

ব্যাঘ্র-বিবরে।

Wilt thou be my dearie ?

Burns.

দুর্ভেদ্য প্রাচীর-পরিখাবেষ্টিত একডালাদুর্গ খরপ্রবাহিনী স্রোতস্বিনীকূলে বড় সুন্দর শোভা পাইতেছে। উহার বজ্রকঠিন প্রস্তরগঠিত পাদদেশ ধৌত করিয়া সান্ধ্যবায়ুতাড়িতলহরীমালা মৃদুমধুর নিনাদে চতুর্দ্দিক ধ্বনিত করিয়া শুভ্র ফেনরাশি উদগীরণ করিতেছে;—যেন কোন যৌবনভারাবনতা পূর্ণাঙ্গী তন্বী প্রেমোচ্ছ্বাসে কুসুমসম্ভার হস্তে লইয়া কোন প্রবল পরাক্রান্ত আরাধ্যদেবতার চরণে মন্ত্রপূত পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছে। নীল নভোমণ্ডল স্বচ্ছ, পরিষ্কার—সর্ব্বত্র মেঘচিহ্নবর্জ্জিত; তাহাতে গর্ব্বোন্নত দুর্গশিখর আলেখ্যবৎ চিত্রিত দেখাইতেছে। সেই দুর্গশিখর কচিৎ ধারাশীকরবাহী সমীরণচুম্বিত হইয়া সিক্ত হইতেছে! দূরে—তরঙ্গিনীর অপর পার্শ্বে বহুদূরবিস্তৃত প্রান্তর। প্রান্তরে তৃণশস্যের হরিতশোভা—সে শ্যামল শোভা অনন্তপ্রসারিণী—অনন্তবিস্তৃতা—সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা বঙ্গের মূর্ত্তিমতী বর্ণনাস্বরূপ। দুর্গের ভিতরদেশ নানাজাতীয় বৃক্ষলতা এবং পথঘাটও সরোবরাদিতে চিত্রিত। তাহাদের মাঝে মাঝে সুদৃঢ় পাষাণাট্টালিকামালা দণ্ডায়মান। এই সকল গৃহগুলির প্রাচীর প্রস্তরময়, দুর্ভেদ্য—দ্বার লৌহনির্ম্মিত। প্রতিদ্বারে শাস্ত্রী প্রহরী উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে পাহারা দিতেছে। পাঠকপাঠিকাকে

আমার সহিত এখন একবার ইহাদেরই কোন একটী ঘরে ঢুকিতে হইবে।

দুর্গের সর্ব্বাপেক্ষা সুদৃঢ় অংশে কোন একটী মৃত্তিকাগর্ভনিহিত নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া দুইজন লোক বাক্‌বিতণ্ডায় নিযুক্ত। কক্ষের বাহিরে বহুদূরে প্রহরী প্রহরায় দণ্ডায়মান। ভিতরে সুকোমল গালিচাস্তরণযুক্ত ক্ষুদ্র আসনে বসিয়া বিশ্বমনোমোহিনী উজ্জ্বলবামাকৃতি—আর তাহারই পদতলে কিয়দ্দূরে জানুপাতিয়া বসিয়া আর একজন বলিষ্ঠগঠন দৃঢ়মূর্ত্তি যোদ্ধৃপুরুষ।

এই দুই ব্যক্তির মধ্যে কি বাক্‌যুদ্ধ চলিতেছিল, তাহার কিয়দংশ মাত্র পাঠক পাঠিকাকে শুনাইব।

রমণী। তোমার কোন কথা আমি শুনিতে চাই না—তুমি দূর হও।

পু। তুমি কি কিছুই চাও না—তোমার হৃদয়ে কি সুবর্ণ-গ্রামেশ্বরী হইবার আকাঙ্ক্ষাও বলবতী নয়?

রমণী। সুবর্ণগ্রামেশ্বর যদি কখনও এ অভাগিনীকে তাঁহার সিংহাসনে স্থান দিতে চাহেন, তবে তখন এ কথার বিচার করা যাইবে—আমি তাঁহাকেই এ প্রশ্নের উত্তর দিব—তোমাকে নহে।

পু। ভাল, সে সুবর্ণগ্রামেশ্বর কে ফতেমা? বল্লাল না বাহাদুর? বল্লাল ত কাফের। আর বাহাদুর? সিহাবুদ্দীনের বিজয়পতাকা যে মুহূর্ত্তে সুবর্ণগ্রামে উড্ডীন হইবে, সে মুহূর্ত্তেই না তাঁহাকে আমি ভূতলে টানিয়া ফেলিয়া দিয়া সিংহাসনটী অধিকারীকৃ করিয়া বসিব? তারপর?

ফ। রাজদ্রোহী—বর্ব্বর—পাপিষ্ঠ—

পু। তারপর ফতেমা, তুমি আমার হইবে?

ফতেমার চক্ষু ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। সে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল,—"দুবৃত্ত, শয়তান, আমার সম্মুখ হইতে দূর হও—নতুবা পদাঘাতে তোমায় এইদণ্ডে বিদায় করিব।"

পুরুষ রাগিল না, অথবা রাগিলেও সে ভাব প্রকাশ করিল না। কিন্তু তাহার হৃদয় প্রবল আকাঙ্ক্ষার তীব্র পীড়নে জ্বলিতে লাগিল। সে কহিল,—

"পদাঘাত! সে ভয় দেখাইও না সুন্দরি, তোমার পদাঘাত ত আমার কুসুমাঞ্জলি—তুমি অধমের অঙ্গস্পর্শ করিবে, সেত আমার সৌভাগ্য।"

ফ। থাক্—আমি তোমায় পদদ্বারাও স্পর্শ করিতে চাহি না—তাহাতে আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গই অপবিত্র হইবে। আমিই এস্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি।

পু। সুন্দরি, মার্জ্জনা কর—কক্ষ পরিত্যাগের চেষ্টা করিলে আমি তোমার কোমল অঙ্গস্পর্শের সুখানুভব করিতে বাধ্য হইব।

এই কথা কহিয়া সেই পুরুষ সত্য সত্যই গমনোদ্যতা ফতেমার হস্তধারণ করিতে উদ্যত হইল।

ফতেমা বিদ্যুদ্বেগে সরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—"হাসিম, হাসিম, সাবধান! যে দেহকে সুবর্ণগ্রামের রাজ্ঞী বলিয়া সম্মানপ্রদর্শন করিয়াছ, তাহাকে স্পর্শ করিয়া কলুষিত করিও না।"

"সুবর্ণগ্রামাধিপতি সুবর্ণগ্রামরাজ্ঞীর দেহস্পর্শ করিবে, তাহাতে আপত্তি কি, ফতেমা? সুবর্ণগ্রামাধিপেরও কি সুবর্ণগ্রামেশ্বরীর দেহের উপর সম্পূর্ণ অধিকার নাই।"

হাসিম হাসিয়া এই কথা কহিয়া, আবার ফতেমাকে ধরিতে অগ্রসর হইল। কিন্তু সেই সময়ে ফতেমার ও হাসিমের উভয়েরই

চরণতল অকস্মাৎ মৃত্তিকাবদ্ধ হইয়া গেল—কাহারই আর নড়িবার ক্ষমতা রহিল না। সেই মুহূর্ত্তে কে একজন অতি তেজস্বী ও রূপবান পুরুষ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া সে কক্ষে প্রবেশ পূর্ব্বক কহিলেন,—"হাসিম্, তুমি যথার্থ কহিয়াছ - সুবর্ণগ্রামাধিপই সুবর্ণগ্রামেশ্বরীর অধিকারী। দেখ, সেজন্যই আমি ফতেমাকে দাবী করিতে এখন এস্থানে উপস্থিত হইয়াছি। ফতেমা, তোমার উজ্জ্বল রূপরাশি সুবর্ণগ্রামের সিংহাসনের শোভা বর্দ্ধন করিবার উপযুক্ত বটে। তুমি কি যথার্থই সুবর্ণগ্রামাধিশ্বরী হইবার কামনা কর?"

এই ব্যক্তিকে দর্শন করিয়া হাসিম এক মুহূর্ত্ত বজ্রাহতবৎ দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু তারপরই কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া কম্পিতকণ্ঠে কহিল,—"সাজাদা বাহাদুর,—প্রভো,—"

'বাহাদুর!' সর্ব্বনাশ! এ ব্যক্তি কে? ফতেমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। বিস্ফারিত নেত্রে সেই উজ্জ্বল উন্নত বপু দর্শন করিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ফতেমা উত্তর করিল,—"প্রভু, বাঁদী না বুঝিয়াই বাতুলতা প্রকাশ করিয়াছে—বাঁদীর আস্পর্দ্ধা মার্জ্জনা করুন।"

বাহাদুর হাসিয়া উত্তর করিলেন, "আচ্ছা সে কথার পরে বিচার করা যইবে—আপাততঃ তোমাদের উভয়কেই আমার সঙ্গে যাইতে হইতেছে—তোমরা আমার বন্দী।"

এই কথা কহিয়া বাহাদুর অঙ্গুলিসংযোগে একটী ইঙ্গিত-ধ্বনি করিলেন। সে শব্দ শুনিয়া যে প্রহরী বাহিরে দাঁড়াইয়া এতক্ষণ প্রহরায় নিযুক্ত ছিল, সে আসিয়া হাসিমকে হাতকড়ি লাগাইল। হায়, যে এতদিন হাসিমের অনুজ্ঞায়ই উঠিয়াছে বসিয়াছে, সেই নাকি এখন তাঁহাকে বাঁধিয়া লইয়া যায়!

বাহিরে আসিয়া সকলে দেখিল, সেই স্থলে আরও দুইজন বন্দী উপস্থিত। ফতেমা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল, সেই বন্দীযুগলও ঠিক তাহাদেরই অনুরূপ—একজন পুরুষ, একজন স্ত্রীলোক! ফতেমা, পদ্মাবতী ও কেশবকে কখনও দেখে নাই—কখনও তাঁহাদের কথা শুনে নাই—কাজেই বড় আশ্চর্য্য হইয়া গেল। পদ্মাবতীও তুল্য আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া ফতেমার দিকে চাহিয়া রহিল।

বাহাদুর উভয়ের এই বিস্মিতবদন লক্ষ্য করিয়া বিশেষ আমোদ অনুভব করিলেন। তাঁহার আদেশে অবিলম্বেই বন্দীগণ বহুসংখ্যক সশস্ত্রপ্রহরীবেষ্টিতভাবে সুবর্ণগ্রামে প্রেরিত হইল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

—:o:—

বিচার।

Go, Go, be innocent,—and leave!

Moore.

মহারাজাধিরাজ বল্লালসেনের নিকটে হাসিম ও কেশবের বিচার হইল। উভয়েই অতি কাতরকণ্ঠে মার্জ্জনা ভিক্ষা করিল। কিন্তু বল্লাল সেন কহিলেন,—"তোমরা অন্য অপরাধী হইলে, আমি তোমাদিগকে মার্জ্জনা করিতে পারিতাম—কিন্তু তোমরা দেশের শত্রু, রাজার শত্রু, সমাজের শত্রু—তোমাদিগকে মার্জ্জনা করিলে, আমি রাজধর্ম্মে পতিত হইব। হাসিম, তুমি সাজাদা

বাহাদুরের রাজ্যে বাস করিয়া তাঁহারই নিমক খাইয়া তাঁহারই সর্ব্বনাশ করতে সঙ্কল্প করিয়াছিলে,—আবার বিনাপরাধে বেণী-প্রসাদকেও হত্যা করিয়াছ, তোমায় শাস্তি প্রদান অবশ্য কর্ত্তব্য। আর কেশব, তুমি আমারই বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী হইয়া আমারই বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছ—নয়নচাঁদের জীবন বিষ-প্রয়োগে নষ্ট করিয়াছ—আমি তোমাকেও বিনা প্রতিফল প্রদানে মুক্ত করিতে পারি না। তোমরা যে অপরাধ করিয়াছ, তাহাতে প্রাণদণ্ডই তোমাদের যথোপযুক্ত শাস্তি—কিন্তু আমি তোমাদের কলুষিত রক্তে আমার এই হস্ত কলঙ্কিত করিতে চাই না। তোমরা আজ হইতে নির্ব্বাসিত হইলে। অতঃপর কাল হইতে সুবর্ণগ্রামের চতুর্সীমায় যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে তোমাদের সাক্ষাৎ লাভ হইলে, বিশেষ বিপদ ঘটিবে। সুবর্ণগ্রামের পবিত্র ভূমি হইতে দূর হইয়া, এইদণ্ডে তোমরা অন্যত্র প্রস্থান কর।”

এই রাজদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া কেশব ও হাসিম সেই দিনই সুবর্ণ গ্রাম পরিত্যাগ করিল। দু'জনে এক সঙ্গে একই পথে চলিল। পথে হাসিম কেশবকে জিজ্ঞাসা করিল,—“এখন কোথায় যাইবে?”

কেশব কহিল,—“এ অপমানের প্রতিশোধ চাই। আমি গৌড়েশ্বরের জন্য পদ্মাবতীকুসুম চয়ন করিয়াছিলাম—সে কুসুম বল্লালসেন জোর করিয়া কাড়িয়া লইল। আমি একথা গৌড়েশ্বরের নিকট উপস্থিত না করিয়া ছাড়িব না।”

হাসিম কহিল,—“এ উত্তম কথা, তুমি উত্তম সঙ্কল্প করিয়াছ—আমারও মুখের গ্রাস বাহাদুর কাড়িয়া লইয়াছে—আমিও এর প্রতিশোধ না লইয়া ছাড়িব না। চল, আমিও তোমার সাহায্যে যাই।”

উভয়েই গৌড়ের পথ অবলম্বন করিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

—*—

দৌলৎ-উন্নিসার খবর।

Come, live with me and be my love,

Christopher Marlowe.

বাহাদুর দৌলৎউন্নিসার খবর জানিবার জন্য বড় উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। সুবর্ণগ্রামে পৌঁছিবার পরেই তিনি ফতেমাকে ডাকিয়া আনিয়া কহিলেন,—"তুমি দৌলৎ-উন্নিসার কথা কহিতে আসিয়াছিলে। কৈ, সে কথাত এখনও বলিলে না—এখন সেই কথা বল।"

ফতেমা ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিল,—

"সাজাদা, বাদীর অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। আমি স্ত্রীলোক. স্ত্রীলোক হইয়াও গৌড় হইতে সাজাদার জন্য এ সংবাদ লইয়া ছুটিয়া আসিয়াছি। সাজাদা আমায় এ জন্য কি পুরস্কার দিবেন, তাহা অগ্রে আদেশ করুন।"

অন্যে এ কথা কহিলে, বাহাদুর কি উত্তর দিতেন জানিনা, কিন্তু ফতেমার মুখখানা বড় সুন্দর, বড় উজ্জ্বল,—বাহাদুর তাহার উপর রাগ করিতে পারিলেন না। হাসিয়া কহিলেন,—"তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই—তুমি কি যাচ্ঞা কর?"

ফ। সাজাদা, হাসিবেন না, তবে শুনুন আমি কি চাই। আমি মুখরা, বলিতে লজ্জা নাই—আমি সাজাদার নিকটে একটা স্বামী-প্রার্থিনী হইয়া আসিয়াছি। অনুমতি করুন, আমি যাহাকে মনোনীত করিব, সেই ব্যক্তি আমার স্বামী হইবে।

ফতেমার প্রগল্‌ভতা দেখিয়া বাহাদুর বড় আশ্চর্য্য হইলেন।

কহিলেন,—ফতেমা, তুমি যথেষ্ঠ মুখরা বটে—তুমি কি সুবর্ণগ্রামাধিপের আবেদনও অগ্রাহ্য করিলে?

ফ। সুবর্ণগ্রামাধিপ দৌলৎ-উন্নিসার প্রার্থী—আমার ত নহেন।

বা। এ কথা তোমায় কে কহিল? আমি তোমার সৌন্দর্য্য দেখিয়া একান্ত মুগ্ধ হইয়াছি—আমি তোমাকেও চাই।

ফ। সাজাদা কি তবে দৌলৎউন্নিসাকে পরিত্যাগ করিলেন?

বা। কখনই না—তা কেন করিব? দৌলৎ-উন্নিসা আমার শৈশবের প্রণয়িনী—তাহাকে আমি কখনই বিস্মৃত হইতে পারিব না। আমি দৌলৎকেও চাই—তোমাকেও চাই।

ফ। অসম্ভব!

বা। কেন, অসম্ভব কেন ফতেমা?

ফ। ফতেমা সপত্নী জ্বালা সহিতে পারিবে না।

বা। তুমি ভুল বুঝিতেছ। দৌলৎ-উন্নিসা সপত্নীকে ঘৃণা করিবে না। তোমার যেমন বাহির সুন্দর—দৌলতেরও তেমনি ভিতর বড় মনোরম। ফতেমা—হিংসা, দ্বেষ সে কখনও জানে না। তুমি তাহাকে চেন না, তাই একথা কহিতেছ।

ফ। যাক্ যাক্ জাহাপনা—আমি তাহার প্রশংসাবাদ শুনিতে আসি নাই—আমার প্রার্থিত পুরস্কার দিবেন কিনা বলুন।

ফতেমার দৌলৎ-উন্নিসা-দ্বেষ দেখিয়া বাহাদুর হাসিলেন। কহিলেন,—"কিন্তু সে পুরস্কারে তোমার কি প্রয়োজন, ফতেমা? তুমি যাহাকে অনুগ্রহ করিবে, সে ত হাতে আস্‌মান পাইবে।"

ফ। আমার প্রার্থনা কেবল ঐটুকুই নহে জাহাপনা, আমার আরও একটা বাঞ্ছা আছে—সে ব্যক্তি আর কখনও দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিতে পারিবে না।

বা। ফতেমা, হীরক খণ্ড পাইয়া কে সাধ করিয়া পুনঃ কাচ খণ্ড কণ্ঠে ধারণ করিতে বাসনা করে?

ফ। জাহাপনা—বিদ্রূপ করিবেন না। বাঁদীর যদি এতই সৌভাগ্য, তবে জাহাপনা এইমাত্র তাহা পরিত্যাগ করিয়া অন্য কামিনীতে স্পৃহা করিতেন না।

বা। এ তোমায় অন্যায় ধারণা, ফতেমা। আমি যখন দৌলৎকে পাইয়াছিলাম—তখন তোমাকে পাই নাই, সুতরাং আমার সঙ্গে তোমার সে কথা খাটিতে পারে না। কিন্তু যাক্, সে কথায় আর দরকার কি? এখন বল, কাহাকে তুমি ভাগ্যবান করিতে, মনস্থ করিয়াছ।

ফ। তবে প্রতিশ্রুত হইলেন, সাজাদা?

বা। যদি সে ব্যক্তি আমার করায়ত্ব হয়—আর যদি সে এমনই অন্ধ হয় যে, তোমার ও দুর্ল্লভ রূপরাশিও তাহায় মুগ্ধ করিতে পারে না, তবে নিশ্চয়ই সে আমি চেষ্টা করিব। কিন্তু কে সে ভাগ্যবান, ফতেমা?

ফ। সাজাদা, বলিতে আশঙ্কা হইতেছে।

বা। কিসের আশঙ্কা, আমি অভয় দিলাম—নির্ভয়ে বল কে সে?

ফ। জাহাপনা, সে ব্যক্তি সাজাদা স্বয়ং।

বা। সর্ব্বনাশ ফতেমা, আমি যে দৌলৎ-উন্নিসাকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারিব না।

ফ। দোহাই সাজাদা—প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন, দৌলৎ-উন্নিসাকে আর মনে স্থান দিবেন না।

বা। অসম্ভব ফতেমা, অসম্ভব! ভাল, তুমি ত দৌলৎ-উন্নিসার খবর এখনও আমায় প্রদান কর নাই, ফতেমা—আমি

আর তোমার নিকট সে খবর জানিতে চাহি না—তুমি এখনি প্রস্থান কর আমি তাহাকে নিজেই খুঁজিয়া লইব।

ফ। তবে সেই ভাল সাজাদা, আমি চলিলাম। কিন্তু মনে রাখিবেন, যে অন্ধ প্রেমিক নিজ সম্মুখে তাহার প্রণয়পাত্রীকে স্বচক্ষে দেখিয়াও চিনিতে পারিল না—সে ত্রিভুবন খুঁজিয়া ইহজীবনে কোথাও তাহার সন্ধান পাইবে না।

এই কথা কহিয়া ফতেমা কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার মাত্র বাহাদুরের দিকে চাহিয়া প্রস্থানোদ্যতা হইল। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে বাহাদুরের মনে হঠাৎ একটা অস্পষ্ট আলেখ্য জাগিয়া উঠিল। ফতেমার সেই হাস্যরঞ্জিত চক্ষুদুটী যেন বাহাদুরের চিরপরিচিত বলিয়া বোধ হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে লাফাইয়া পড়িয়া বাহাদুর তাহার হস্তধারণ করিয়া ফিরাইয়া কহিলেন,—"সে কি ফতেমা? এ কি কথা ফতেমা? ফের—ফের।"

তারপর তাহার সেই উজ্জ্বল মুখের দিকে বিস্ফারিত নেত্রে একটা তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তিনি পুনঃ বলিলেন,——"ফতেমা, সত্য কহ দেখি তুমি কে?"

ফতেমা, 'খিলখিল' করিয়া হাসিয়া উঠিল। কহিল,—"ভাল বাহাদুর, দৌলৎ-উন্নিসাকে কি এতই বিস্মৃত হইয়াছ যে, বার বার দেখিয়াও চিনিতে পারিতেছ না?"

তখন বাহাদুর আনন্দ গদ্‌গদ্ স্বরে উচ্চকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন,—"চিনিয়াছি দৌলৎ, এতক্ষণে চিনিয়াছি। ক্ষুদ্র কুসুমকোরক আজ প্রস্ফুটিত চারুপ্রসূনে পরিণত হইয়াছে—তাই এতক্ষণ চিনিতে পারি নাই। কিন্তু এখন তোমায় বেশ চিনিয়াছি—আর তোমায় ছাড়িব না।"

ফতেমা ভয়ানক মুখরা। সে আবার কহিল,—"কিন্তু আমার ভিক্ষা সাজাদা?"

বাহাদুর হাসিয়া কহিলেন,——"দৌলৎ, নিশ্চিন্ত থাক। এ দৌলৎ ছাড়িয়া বাহাদুর কখনও আর অপর দৌলতে হস্তক্ষেপ করিবে না।"

সেইদিন সুবর্ণগ্রামে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। বাহাদুর চারিদিকে অজস্র আমোদ উৎসব করিবার অনুমতি দিলেন। নানাবিধ উৎসব, আনন্দ ও কৌতুকের মধ্যে বাহাদুর ও দৌলৎ-উন্নিসার শুভ পরিণয়কার্য্য কয়েক দিনের মধ্যেই সুসম্পন্ন হইয়া গেল। হাফেজ ফতেমাকে দৌলৎ-উন্নিসার পদে উন্নীত হইতে দেখিয়া প্রথমে বড় ভয় পাইয়াছিল, কিন্তু পরেও যখন দৌলৎ-উন্নিসা তাহাকে সেইরূপই আদর যত্ন করিতে লাগিলেন, তখন আর তাহার আনন্দের সীমা রহিল না।

কয়েকদিন পরে দৌলৎ-উন্নিসা হাফেজকে কহিলেন,—"ভাই, পিতামহের জন্য আমার মনটা বড় উদ্বিগ্ন হইতেছে। তিনি হয়ত আমাদের এ সব বিষয় কিছুই অবগত নহেন। তুমি এক্ষণে একবার সেখানে যাও। আমার ত আর তাহার চরণদর্শন সহজে ঘটিয়া উঠিবে না। তুমিই আমার হইয়া এখন তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিবে। তাঁহাকে বলিও, তাঁহার ফতেমা তাঁহাকে ইহকালে কখনও বিস্মৃত হইবে না—আর তাঁহার সংবাদ সে প্রাণান্তেও অপর কাহারও নিকটে প্রকাশ করিবে না।"

হাফেজ সজল নয়নে সেই দিনই 'হরিতালী' গ্রামাভিমুখে প্রস্থান করিল। যাইবার কালে দৌলৎ-উন্নিসা তাহাকে অনেক ধন রত্ন দিয়া বিদায় করিল। কহিয়া দিল,—"পিতামহের স্বর্গপ্রাপ্তি হইলে,

যথারীতি তাঁহার সমাধি করিও—আর তারপর আর একবার আসিয়া আবার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও।”

বহুদিনের দুইটী একত্রগ্রথিতকুসুম অকস্মাৎ ছিন্ন হইয়া আজ যেন ম্লান হইয়া গেল। হাফেজ শূন্যহৃদয়ে গৃহে ফিরিল। দৌলৎ-উন্নিসা আপনার সুখসমৃদ্ধির ভিতরে এক দিনের তরেও হাফেজকে ভুলিতে পারিল না।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

—:•:—

রাজাবরোধে।

Where are the joys I have met in the morning,

Burns.

‘ঢেঁকি স্বর্গে যাইয়াও ধান ভানে’—কথাটা ঠিক। পদ্মাবতীর অদৃষ্ট ফিরিয়াও ফিরিল না। মুক্তিলাভ করিয়া, সে বড় আশাই করিয়াছিল, আবার তাহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, এইবার সে বিজয়চাঁদের সহিত চিরমিলিত হইবে—কিন্তু ‘মানুষ মনন করে এক, আর দেবতা করে আর’—পদ্মাবতী ক্রমে ক্রমে সে কথার যাথার্থ্য অনুভব করিল।

পদ্মাবতী পথেই শুনিল, তাহার পিতা মরিয়াছে। সুতরাং সুবর্ণগ্রামে পৌঁছিয়া প্রথমেই সে শ্যামলীর সন্ধান করিল। শ্যামলী এ পর্য্যন্ত বল্লালসেনের আশ্রয়েই বাস করিতেছিল। এখন পদ্মাবতীকে পাইয়া বল্লালসেনের নিকট পুনঃ স্বালয়ে যাইবার অনুমতি ভিক্ষা করিল। কিন্তু বল্লালসেন কহিলেন,—“তোমরা এখন নিরাশ্রয়—নির্জ্জনে একাকী থাকা আর তোমাদের ভাল

দেখায় না। আজ হইতে তোমরা আমারই অন্তঃপুরভুক্তা হইলে। যতদিন ইচ্ছা এখানেই বাস করিতে পারিবে—আর কোথাও যাইবার প্রয়োজন নাই।"

পদ্মাবতী বুঝিল, কথাটা ঠিক। পদ্মাবতী স্বীকৃত হইল। কিন্তু ইহাতে তাহার একটা বড় অসুবিধা ঘটিল। পদ্মাবতীর সঙ্গে বিজয়চাঁদের সাক্ষাৎকারের পথ এখন একরূপ বন্ধ হইয়া গেল। রাজান্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া অন্যত্র যাওয়া কাহারও পক্ষে সুলভ নহে। কিন্তু পদ্মাবতী কি করে?—অগত্যা অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়াই চুপ করিয়া রহিল। তাহার বিশ্বাস রহিল, বিজয়চাঁদ অবশ্য পদ্মাবতীর পাণিগ্রহণার্থ রাজদ্বারে উপস্থিত হইবেন।

কিন্তু পদ্মাবতী ক্রমে দেখিল, তাহার বিশ্বাস ভুল। বিজয়চাঁদ পদ্মাবতীর সংবাদ লওয়া দূরে থাক্‌, শ্যামলী তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলে, তিনি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেও স্বীকৃত হইলেন না। দেখিয়া শুনিয়া পদ্মাবতীর হৃদয়ে ক্রমে ক্রমে একটা নূতন সন্দেহ জাগিয়া উঠিল।

পদ্মাবতী বিচার করিল,—কেন এরূপ হইল? তিনি কি আমায় ভুলিয়া গেলেন? না, সে কথা হইতে পারে না। এত শীঘ্র ভুলিয়া যাইবেন—এ অসম্ভব। তবে কেন এরূপ হইল? তবে কি তিনি আমার পবিত্রতায় সন্দিহান হইলেন?

পদ্মাবতীর একথাটা মনে করিতেও বড় কষ্ট হইল। কিন্তু সন্দেহবৃশ্চিক দয়া মায়া করিয়া কাহাকেও দংশন করিতে বিরত হয় না। পদ্মাবতী স্থির সিদ্ধান্ত করিল,—নিশ্চয়ই এই কথা—তিনি নিশ্চয়ই পতিতা বলিয়াই আমায় পরিত্যাগ করিয়াছেন।

যত দিন যাইতে লাগিল, তত পদ্মার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইতে

লাগিল, তত তাহার শরীরও ক্রমে শুষ্ক ও শীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। পদ্মা প্রথমে প্রথমে মধ্যে মধ্যে শ্যামলীকে বিজয়চাঁদের নিকট প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে অনুরোধ করিতে, নানারূপে বুঝাইতে চেষ্টা পাইল; সংশয় অপনোদনের জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিল। কিন্তু তাহাতে যখন বিশেষ কিছু ফল দর্শিল না, তখন ক্রমে ক্রমে নৈরাশ্যের সহিত তাহার অভিমানবহ্নিও একটু একটু করিয়া প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। পদ্মা অবার নীরব রহিল, অদৃষ্ট ও বিধাতার উপর নির্ভর করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

বল্লালসেন পদ্মাবতীর অবস্থা লক্ষ্য করিলেন। কিন্তু তিনি বিজয়চাঁদ হইতে সকলই অবগত হইয়াছিলেন—অবগত হইয়াছিলেন বলিয়াই, তিনি এতদিন বিজয়চাঁদের সহিত পদ্মাবতীর বিবাহ দেন নাই—অবগত হইয়াছিলেন বলিয়াই পদ্মাবতীকে নিজের অন্তঃপুরে রাখিবার এ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—আর অবগত হইয়াছিলেন বলিয়াই পদ্মাবতীর বিবাহের জন্য অন্যত্র কোন প্রস্তাবও এতাবৎ উত্থাপন করেন নাই। সুতরাং পদ্মাবতীর এ অবস্থা লক্ষ্য করিয়া তিনিও ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না—নীরবেই অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি পদ্মাবতীকে ভাল বাসিতেন—এককালে প্রণয়ের চক্ষেও দর্শন করিয়াছিলেন—তাহার রূপরাশি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করিতেও গিয়াছিলেন—পাঠক এসব কথা অবগত আছেন—তাই পদ্মাবতীর দুঃখে তাহারও হৃদয় ক্লিষ্ট হইতেছিল। কিন্তু তবুও তিনি ভ্রমেও তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কিছু জিজ্ঞাসাবাদ কিম্বা সান্ত্বনাপ্রদানের চেষ্টা করিলেন না। ব্যর্থ-মনোরথ প্রেমিকের পদে পদে অপরাধ—বল্লাল সেটা বুঝিতেন। বুঝিয়াই চুপ করিয়া রহিলেন।

বিজয়চাঁদ বড় আশঙ্কা করিয়াছিলেন, পদ্মাবতী নিষ্কৃতি লাভ করিয়া বড় একটা গোলযোগ বাঁধাইবে। তখন তিনি কি করিয়া পদ্মাবতীকে যে বিষম সত্য জ্ঞাপন করিবেন, ভাবিয়া ভাবিয়া তিনি বড়ই আশঙ্কান্বিত হইয়াছিলেন—তাই তিনি বল্লালসেনকে সমস্ত কথা কহিয়া, তাঁহারই অন্তঃপুরে পদ্মাবতীকে বন্দিনী করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। এখন চারিদিকেই এই নিস্তব্ধ-ভাব দর্শন করিয়া তিনি অনেকটা হাফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। কিন্তু দিন দিন তাঁহার যাতনা বড় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সে যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি অবশেষে একটা সংকল্প স্থির করিলেন। মনে করিলেন, একবার তীর্থদর্শনে মনের পাপ ও অশান্তি উভয়ই কাটিয়া যাইতে পারে। তিনি পান্নাকে কহিলেন, "পান্না, আমি তীর্থ-ভ্রমণে যাইব—তোমাকে কতক দিন অন্যত্র থাকিতে হইবে।"

পান্না দাদার সুখ দুঃখের বিবরণ জানিত—বিশেষ উচ্চবাচ্য করিল না। বিজয় তল্পিতল্পা গুছাইতে লাগিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে সুবর্ণগ্রামে এক ভীষণ সংবাদ পৌছিল। সে সংবাদে চারিদিকে হুলুস্থূল পড়িয়া গেল বিজয়চাঁদেরও তীর্থভ্রমণের প্রয়োজন তাহাতে ফাঁসিয়া গেল। সংবাদ আসিল—সিহাবুদ্দীনের দশসহস্র সৈন্য লইয়া কেশবলাল ও হাসিম শীঘ্রই সুবর্ণগ্রাম দখল করিতে আসিতেছে। বিজয়চাঁদ ভাবিলেন, তবে আর তীর্থ-ভ্রমণের প্রয়োজন কি? এখন যুদ্ধ-বিগ্রহেই কোনরূপে জীবনটা কাটাইয়া দেওয়া যাউক।

বিজয়চাঁদ মহাসমারোহে সৈন্যদিগকে সমর শিক্ষা দিতে লাগিলেন। দিবারাত্রি অস্ত্রশস্ত্রসঞ্চালনেই তাঁহার সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল।

তৃতীয় খণ্ড।

ইতিহাসের এক অধ্যায়।

And doth not a meeting like this make amends,

For all the long years I've been wand'ring away—

Moore.

বঙ্গ-বিজয়।

তৃতীয় খণ্ড।

—:0:—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—০—

গৌড় ও সুবর্ণগ্রাম।

See ! the conqu'ring hero comes !
Sound the trumpets, beat the drums !
Sports prepare, the laurels bring,
Songs of triumph to him sing !

Judas Maccabeus.

কেশবলাল ও হাসিম গৌড়ে উপস্থিত হইয়া, সিহাবুদ্দীনকে সকল কথা বিদিত করিল। শুনিয়া গৌড়েশ্বর অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। একেই সিহাবুদ্দীন বাহাদুরের উপর চটা—তা'র উপর আবার এই অপমান! সিহাবুদ্দীন এবার হাড়ে হাড়ে চটিলেন।

তাঁহারই প্রণয়পাত্রী দৌলৎ উন্নিসাকে কিনা বাহাদুর নিজ অঙ্ক-লক্ষ্মী করিল? তাঁহারই অর্চ্চনার্থে রক্ষিত পদ্মাবতীকুসুম হইতেও কিনা তাঁহাকে বঞ্চিত করিল! সিহাবুদ্দীন ভাবিলেন,—বাস্তবিক বাহাদুরের বড় আস্পর্দ্ধা হইয়াছে—এইবার তাহাকে কিছু শিক্ষা দিতে হইবে। তিনি অগোণে সুবর্ণগ্রাম আক্রমণের জন্য অনুমতি প্রচারিত করিলেন।

কিন্তু একটা কথায় সিহাবুদ্দীন বড় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, কেশবলাল হিন্দু হইয়াও হিন্দুর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে চায় কেন? সুবর্ণগ্রামবাসী হইয়াও সে স্বদেশের বিরুদ্ধে গৌড়েশ্বরের সাহায্যার্থ উপস্থিত হইল কেন? সিহাবুদ্দীন বঙ্গ-বাসিগণের চরিত্র বিশেষভাবে অবগত ছিলেন না, তাই তিনি একথাটা বুঝিতে পারিলেন না। তাই তিনি বুঝিলেন না যে, হিন্দু হইয়া হিন্দুর বিরুদ্ধে দাঁড়ান, স্বদেশবাসী হইয়া স্বদেশের সর্ব্বনাশে কৃতসংকল্প হওয়া, অন্য জাতির পক্ষে যতই অসম্ভব হউক, বঙ্গবাসীর পক্ষে ততটা নহে। তাই তিনি বড় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার সন্দেহ অপনোদিত হইল। হাসিম অবিলম্বে তাঁহাকে সকল কথা বুঝাইয়া দিল। শুনিয়া সিহাবুদ্দীন্ মনে মনে একটু হাসিলেন;—সেক্ষপীরের 'নিদাঘ-নিশীথ-স্বপ্নের' 'বটম'কে দেখিয়া পাঠক যেমন হাসেন, বৃক্ষোপরি অরূঢ় ব্যক্তি স্বীয় অবলম্বনশাখাটী ছেদন করিতে উদ্যত হইলে, তাহা দেখিয়া লোকের যেমম হাসি পায়, তিনি তেমনি হাসিলেন; আর একটু প্রীতও হইলেন। ভাবিলেন,—উত্তম, কণ্টক উদ্ধার করিতে হইলে কণ্টকেরই প্রয়োজন হয় বটে। আমি এই কণ্টক দ্বারাই এ কার্য্য উদ্ধার করিব। তার পর কার্য্য সিদ্ধান্তে উভয় কণ্টকই তৃণবৎ সবলে দূরে

নিক্ষেপ করিয়া দিব। এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি কেশবকে একদিন নিজ সন্নিধানে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—

"কেশব, তোমাকে দেখিয়া আমার বেশ কাজের লোক বলিয়াই বোধ হইতেছে। তোমার সহায়তা পাইয়া আমি বিশেষ প্রীত হইলাম। তুমি সুবর্ণগ্রামের সকল অন্ধি সন্ধি জ্ঞাত আছ, সন্দেহ নাই। যদি সুবর্ণগ্রাম বিজয়ে হাসিমকে উপযুক্ত সাহায্য করিতে পার, আমি তোমায় পান্নাসুন্দরী যেমন করিয়া হউক ধরিয়া আনিয়া দিব, আর তদুপরি অর্দ্ধেক সুবর্ণগ্রামের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিব, প্রতিজ্ঞা করিতেছি। তোমরা দু'জন বাস্তবিক এ কার্য্য করিতে সক্ষম হইবে ত" ?

কেশব বিনীত ভাবে অভিবাদন জানাইয়া কহিল,—

"জাঁহাপনা, এ গোলাম নিশ্চয় সুবর্ণগ্রাম আপনার চরণতলে আনিয়া দিবে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি শীঘ্রই সুবর্ণগ্রাম-বিজয়ে যাত্রা করিতেছি।"

সিহাবুদ্দীন কেশবের দৃঢ়তা দেখিয়া বিশেষ প্রফুল্লিত হইলেন, তখনই হাসিমকে ও কেশবকে সেনানায়ক পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যুদ্ধযাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। গৌড়নগরী অকস্মাৎ অস্ত্রের 'ঝন্‌ঝনারবে' প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। সে শব্দের প্রতিধ্বনি যথা-সময়ে সুবর্ণগ্রাম হইতেও দ্বিগুণ রবে উত্থিত হইল। কিন্তু সিহাবুদ্দীন বা গৌড়বাসিগণ তখন মদগর্ব্বে গর্ব্বিত—তাহারা সে স্বর শুনিতে পাইলেন না। এই সামান্য অবহেলা হইতে গৌড়ের সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল।

বাহাদুর অতি বুদ্ধিমান লোক ছিলেন—একথা বলা হইয়াছে। কেশব ও হাসিম গৌড়াভিমুখে ধাবিত হইয়াছেন, একথা জানিতে

পারিয়াই তিনি বুঝিতে পারিয়া ছিলেন যে, গৌড়ে ও সুবর্ণগ্রামে শীঘ্রই একটা প্রবল সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। তাই তিনি পূর্ব্ব হইতেই বল্লালসেনের সহিত পরামর্শ আঁটিয়া একযোগে প্রবল সমরোদ্যোগ করিতেছিলেন। এখন গুপ্তচর-মুখে সিহাবুদ্দীনের দৃঢ় সঙ্কল্পের কথা জানিতে পারিয়া, তিনি আর কালমুহূর্ত্ত বিলম্ব করিলেন না, সকল সৈন্যাদি সমাবেশপূর্ব্বক অবিলম্বে নগর ত্যাগ করিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, শত্রুকে স্বালয়ে আসিতে অবসর না দিয়া, অগ্রসর হইয়া একবারে তাহাদের বিবরেই তাহাদিগকে আক্রমণ করা বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অধিকতর সুবিধাজনক ও ফলপ্রদ হইবে। তাই তিনি সিহাবুদ্দীনকে একবারে গৌড়নগরীতে উপস্থিত হইয়াই আক্রমণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অগণিত সৈন্য-সামান্ত,সিপাহী, অস্ত্রশস্ত্র, অশ্ব-বলদ ও রসদ সঙ্গে চলিল। সৈন্যগণ দুইভাগে বিভক্ত হইল। একভাগ বাহাদুর নিজে পরিচালনা করিতে লাগিলেন, অপর ভাগের নায়কত্ব বিজয়চাঁদ গ্রহণ করিলেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় পরাক্রান্ত শক্তি একত্র গ্রথিত হইয়া বিশ্বকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া চলিল। এই দুই মহাশক্তি চিরকাল সদ্ভাববন্ধনে এইরূপ একত্রগ্রথিত থাকিলে কি না হইতে পারিত? কিন্তু হায়, সে সদ্ভাব-বন্ধন এখন স্বপ্নের অমূলক দৃশ্য মাত্র! সে বাহাদুরও নাই, সে সহৃদয়তাও নাই! বাহাদুর! বাহাদুর! আজ তুমি কোথায়? আজ তুমি থাকিলে হয়ত ভারতের অনেক উপকার হইত।

বাহাদুর অর্দ্ধেক রাস্তা অতিক্রম করিয়াই শুনিতে পাইলেন, কেশব ও হাসিম সুবর্ণগ্রামাভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। তিনি আরও জানিতে পারিলেন, গৌড়ের প্রায় সকল সেনাই এই যুদ্ধ যাত্রায় যোগ দিয়াছে—গৌড় নগরী এখন একরূপ অরক্ষিত।

বাহাদুর এই সংবাদ পাইয়াই কেশব ও হাসিম যে রাস্তায় আসিতে ছিলেন, সে রাস্তা পরিত্যাগ করিয়া অপর একটী বক্র পথ ধরিয়া অতিদ্রুত গৌড়ের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, এই বেলা গৌড়নগরীকে অকস্মাৎ আক্রমণ করিলে, সিহাবুদ্দীনের সমরসাধ একবারে চিরকালের জন্য মিটাইয়া দিতে পারিবেন। তিনি বল্লালসেনকে উপযুক্ত সৈন্যসামন্ত সহ সুবর্ণগ্রাম রক্ষায় রাখিয়া আসিয়াছিলেন, সুতরাং সিহাবুদ্দীনের মত স্বরাজ্যের জন্য তাঁহার তত চিন্তার কারণ ছিল না। কেশব ও হাসিম বর্ণ-গ্রামে গেলেও তাঁহার বিশেষ আশঙ্কার কথা ছিল না। বিশেষতঃ গৌড় অধিকৃত হইলে, তিনি অবিলম্বে কেশব ও হাসিমকে পরাভূত করিতে পারিবেন,এ বিশ্বাস তাঁহার ছিল। তাই তিনি তাঁহাদিগকে, সুবর্ণগ্রাম-গমনে বাধা দিবার চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়াই অবিলম্বে গৌড়ের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

কিন্তু হায়, সিহাবুদ্দীনের দুর্ভাগ্য,সিহাবুদ্দীন এসব কথা মোটেই অবগত নহেন। হাসিম ও কেশবকে প্রেরণ করিয়া তিনি তখন কেবলই সুখের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। তিনি তাহাদের সঙ্গে সুবর্ণগ্রামাধিপতিদ্বয়ের নিকট একটা বিশেষ বীরত্বপূর্ণ লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার তখন বড়ই আনন্দ হইতেছিল। সে লিপির রকমটা পাঠক-পাঠিকাগণকে উপহার দেওয়া উচিত। লিপিখানি এইরূপ,—

"প্রবল প্রতাপান্বিত শ্রীশ্রীগৌড়েশ্বরের আদেশ, এই লিপি প্রাপ্তি মাত্রেই সাহজাদা বাহাদুর শাহ এবং সুবর্ণগ্রামাধিপতি. শ্রীশ্রীবল্লাল সেন, সুবর্ণগ্রামের সিংহাসন তাঁহারই সেনাপতি হাসিম খাঁর করে সমর্পণ করিবেন, আর বেণীপ্রসাদ-দুহিতা

পদ্মাবতীকে অবিলম্বে গৌড়ে প্রেরণ করিয়া তাঁহাদের পূর্ব্বকৃতাপরাধের জন্য শ্রীশ্রীগৌড়েশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন। অন্যথা তাঁহার সেনাপতিদ্বয় কালমুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া,তাহাদিগকে বন্দী করিয়া আনিতে বাধ্য হইবে।"

কি চমৎকার পরওয়ানা! গৌড়েশ্বরের প্রতাপের কি চমৎকার নিদর্শন! সিহাবুদ্দীন মনে করিতেছিলেন, তাঁহার সৈন্যবল-দর্শনে ক্ষুদ্র সুবর্ণগ্রামাধিপতি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া অচিরাৎই তাঁহার নিকটে আত্ম-সমর্পণ করিবেন। বাহাদুর এবং বল্লালসেন যে তাঁহার উদ্দেশ্য কিছুমাত্র তখন অবগত আছেন, এ ধারণা তাঁহার মোটেই হইল না। সুতরাং বাহাদুর হঠাৎ গৌড়ে উপস্থিত হইতে পারেন, ইহা তখন তাঁহার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। কাজেই বাহাদুরের সৈন্যগণ যখন একদিন অপরাহ্নে সত্য সত্যই গৌড়ের অপর পার্শ্ব দিয়া দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইল, তখন তিনি ও সকল নগরবাসিগণ তাহাদিগকে আপনাদিগেরই সৈন্যদল পুনরাগত বলিয়া মনে করিয়া একবারে অপ্রস্তুত অবস্থাতেই ব্যাপার কি দেখিতে আসিলেন। ইহাতে বাহাদুরের আরও সুবিধা হইল। বাহাদুর দুর্গদ্বার উন্মুক্ত পাইয়া বিনা বাধায়ই সন্ধ্যার আঁধারে নির্ব্বিবাদে দুর্গে প্রবেশ করিলেন।

কিন্তু প্রকৃত কথা জানিতে গৌড়বাসিদিগের অধিকক্ষণ ব্যয়িত হইল না। নগরে যে শত্রু প্রবেশ করিয়াছে,তাহা তাহয়া অবিলম্বেই বুঝিতে পারিল। সিহাবুদ্দীন অচিরাৎ বুঝিতে পারিলেন, তিনি স্বেচ্ছায় নিমন্ত্রণ করিয়া শত্রুকে স্বালয়ে ডাকিয়া আনিয়াছেন। তিনি অবিলম্বে নিজের অবস্থাও হৃদয়ঙ্গম করিয়া ফেলিলেন। যে দিকে নদী, নগরের সে দিকটা তখনও শত্রুগণ বেষ্টন করে নাই;

তিনি অবিলম্বে পরিবারাদি লইয়া সেই দিক দিয়া বাহির হইয়া নদীতে নৌকারোহণ করিলেন। তারপর সজল নয়নে গৌড়ের দিকে চাহিতে চাহিতে আপনার অদৃষ্ট মাত্র সঙ্গে লইয়া লক্ষ্যহীন অবস্থায়ই দ্রুত পলায়ন করিতে লাগিলেন।

এত সহজে গৌড় অধিকৃত করিতে সক্ষম হইবেন, বাহাদুর তাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। এখন নগরী অধিকৃত করিয়াই, তিনি নগরবাসিদিগের প্রতি তাঁহার সৈন্যগণের অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতা বন্ধ করিয়া দিলেন। পরদিনই চারিদিকে ঘোষিত হইল, বাহাদুর সাহ গৌড়েশ্বর হইয়াছেন। বাহাদুর সহৃদয় ন্যায়পরায়ণ এবং পরাক্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন—হিন্দু মুসলমানকে তিনি এক চক্ষে দেখিতেন—সুতরাং তাঁহার রাজত্বপ্রাপ্তিতে হিন্দু-মুসলমান উভয়েই আহ্লাদিত হইল। কাজে কাজেই বাহাদুর অবিলম্বেই অতি সহজে নিজকে নূতন রাজত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেন।

সিহাবুদ্দীন বহুদূর হইতে নির্ব্বাসিত অবস্থায় সকলই শুনিলেন। তিনি সেদেশে আর অপেক্ষা করা যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না। ছদ্মবেশে অতিক্রত যাইয়া কেশব ও হাসিমের সহিত যোগদান পূর্ব্বক তিনি অতি সত্বর বঙ্গদেশ অতিক্রম করিয়া ভারতরাজধানী দিল্লী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

বিজয়চাঁদ কিয়দ্দিন গৌড়ে অবস্থান করিয়া পুনঃ সসৈন্যে সুবর্ণগ্রামে ফিরিয়া আসিলেন। বল্লালসেন ও সুবর্ণগ্রামবাসিগণ তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে সজ্জিত করিয়া জয়ধ্বনি পূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিল। অভাগিনী পদ্মাবতী রাজপ্রাসাদের উপর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কণ্টকিত দেহে এইসব প্রত্যক্ষ করিল। আনন্দে তাহার শরীর আপ্লুত হইয়া গেল। কিন্তু সেই সঙ্গে গৃহমধ্যে প্রস্থান কালে এক

ফোঁটা অশ্রুও তাঁহার নয়নকমলদ্বয় সিক্ত করিল। পদ্মাবতী মনে মনে কহিল,—"তিনি এখন অতি বড় হইয়াছেন, তিনি এখন অতি উচ্চে, আমি আর তাঁহাকে ছুঁইতেও পাইব না—আর কি তিনি আমার দিকে ফিরিয়া চাহিবেন? আমার আর আশা নাই।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—*—

আবদুল্লাপুরের যুদ্ধ।

The trumpets sound, the banners fly,
 The glittering spears are ranked ready;
The shouts ofwar are heard after,
 The battle closes thick and bloody.

Burns.

বাহাদুর সকল কার্য্য সুবুদ্ধিমানের মত করিয়াও শেষে একটা বড় ভুল করিলেন। কিছুতেই বাড়াবাড়ি ভাল নহে, বিশেষতঃ রাজকার্য্যে। রাজত্বগ্রহণ বড় কঠিন ব্যাপার, রাজত্বের পথ বড় পিচ্ছল। একটু অসাবধান হইলে আর রক্ষা নাই—অমনি পতন ঘটে। বাহাদুর সব দিক রক্ষা করিলেন বটে, কিন্তু এক দিকে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল না। সেই একদিকের অমনোযোগে শেষটা তাঁহার সর্ব্বস্বান্ত হইবার সূত্রপাত হইল।

মুসলমানদিগের ভারতাগমনের পর হইতে, গৌড়ের মুসলমান নরপতিগণ প্রায়ই দিল্লীর সম্রাটের অধীনে থাকিয়াই বঙ্গে রাজ্য শাসন করিতেন। স্বরাজ্যে তাঁহারা সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেও নামে দিল্লীর

অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেন। বিশেষতঃ সম্রাট বুলবন বাঙ্গলার উপর এই প্রভুত্বটুকু বজায় রাখিবার জন্যই সিহাবুদ্দীন ও বাহাদুরের পূর্ব্বপুরুষ, আপনার কোনও পুত্রকে গৌড়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সেই অবধি এ পর্য্যন্ত দিল্লীতে বার দুই রাজবংশ পরিবর্ত্তন হইলেও, বঙ্গাধিপগণ কদাপি অবাধ্যতা প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু বাহাদুর রাজত্ব গ্রহণ করিয়াই অবিলম্বে আপনাকে এক-বারে স্বাধীন নরপতি বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন। এই অপরি-নামদর্শিতার ফল অতি ভয়ঙ্কর ফলিল। সিহাবুদ্দীন দিল্লীতে যাইয়া সম্রাট গায়েস-উদ্দীন তোগলকের শরণাগত হইলে, সম্রাট অবি-লম্বেই তাঁহাকে বঙ্গেশ্বর ঘোষণা করিয়া, এক প্রবল পরাক্রান্ত সৈন্য-দল সহ বঙ্গাধিকারে যাত্রা করিলেন।

বাহাদুর যখন এ সংবাদ শুনিলেন, তখন আপনার নির্ব্বুদ্ধিতা বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু তখন আর ফেরা চলে না। বাহাদুর গৌড়জয়ের পর হইতে গৌড়েই থাকিতেন, এবং বল্লালসেনকে সুবর্ণগ্রামের একাধিপত্য ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এখন বিপদে পড়িয়া তিনি সুবর্ণগ্রামের সহায়তা যাচ্ঞা করিলেন। বল্লালসেন যাচ্ঞামাত্র তাহাকে প্রাণপণ সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। সুবর্ণ-গ্রামে আবার যুদ্ধের ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল বিজয়চাঁদ পুনঃ যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখিয়া বাঁচিয়া গেলেন। তাহার মুখ হর্ষপ্রফুল্ল হইল। কিন্তু সকলেই বুঝিল, এই বার সবশেষ, এইবার সব নির্ম্মূল হইবে। বাহাদুর প্রবল পরাক্রান্তই হউন, আর বল্লালসেনের সহায়তায় বিশেষ বলীয়ানই হউন, ভারত সম্রাটের নিকট তিনি অতি তুচ্ছ। তাই বাহাদুর, বল্লালাসেন এবং বিজয়চাঁদ সকলেই এবার নিশ্চয় সর্ব্বধ্বংস বুঝিতে পারিয়া, সমরক্ষেত্রে জীবন-বিসর্জ্জন করিতে কৃতসংকল্প

হইলেন। নিশ্চিত মৃত্যু সম্মুখে দেখিয়া বিজয়চাঁদ বিশেষ হরষিত হইলেন। এদিগে প্রজাগণ চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। রাজপুরবাসিনীগণ পদ্মিনী রাণীর কাহিনী শ্রবণ করিয়াছিলেন—তাঁহারা অগ্নিকুণ্ডের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। বীরপুরুষগণের অস্ত্রের 'ঝন ঝন্' শব্দে দেশ মুখরিত হইয়া উঠিল। সকলেই রুদ্ধশ্বাসে সম্রাটের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

কয়েক মাস পরেই সম্রাট বঙ্গে পদার্পণ করিলেন। সংবাদ পাইবা মাত্র বাহাদুর বল্লালসেনের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার গতি-রোধার্থে অগ্রসর হইলেন। বাহাদুরের সৈন্যগণ আসন্ন মৃত্যু বুঝিতে পারিয়া অতুলানন্দে মেদিনী কম্পিত করিয়া চলিতে লাগিল। হিন্দু সৈন্যগণকে বল্লালসেন নিজে চালিত করিতে লাগিলেন। মুসলমানগণ বাহাদুরের নেতৃত্বে "আল্লাহো আকবর" ধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ করিয়া মুক্ততরবারিহস্তে সমরাঙ্গন-অভিমুখে ধাবিত হইল। হিন্দুগণ মুহুর্মুহু "জয় জগদীশ" স্বরে শত্রুর হৃদয় কম্পিত করিল। বল্লালসেন প্রবল উৎসাহে তাহাদিগকে উল্লাসিত করিতে লাগিলেন। বর্ষা, তরবারি, ঢাল ও সরকির 'ঝন ঝন' ধ্বনিতে কর্ণ বধির করিয়া বঙ্গ-বাহিনী প্রাণদিতে ধাবিত হইল। বঙ্গে এক দিন এই রকম বীরত্ব ছিল!

বহুদূরবিস্তৃত উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে উভয় সৈন্যের সাক্ষাৎ হইল। তখন চারিদিকে ঘন ঘন জয়ধ্বনি, অশ্বের হ্রেষা রব ও অস্ত্রের বিপুল ঝঙ্কারে কর্ণ বধির হইয়া গেল। অস্ত্রে অস্ত্রে সংঘর্ষ লাগিয়া বিদ্যুৎ চমকিল। রক্তস্রোতে যোদ্ধাদের শরীর রঞ্জিত হইতে লাগিল। চারিদিকে ছুটাছুটি, দৌড়াদৌড়ি, লম্ফ ঝম্ফ চলিতে লাগিল।

কোথাও কাতর কণ্ঠ, কোথাও বীরত্ববাণী স্ফুরিত হইল। বাহাদুর প্রবল বাহুসঞ্চালনে শত্রুসৈন্য নিপাতিত করিতে লাগিলেন, বল্লালের তরবারি ঘন ঘন শোণিতরঞ্জিত হইতে লাগিল। বিজয়চাঁদ একটু পেছনে পড়িয়া গিয়াছিলেন, পান্নাকে রাজান্তঃপুরে রাখিয়া আসিতে আসিতে তাঁহার একটু বিলম্ব হইয়াছিল—তিনি দূর হইতে এই সমর-কোলাহল শুনিতে পাইয়া প্রবল উত্তেজনায় সেই দিকে অশ্ব ছুটাইয়া দিলেন। কিন্তু এই সময়ে আর একটা নূতন ব্যাপার ঘটিল। সমরের ফলাফল বর্ণনার পূর্ব্বে, পাঠক পাঠিকাকে সেই কথাটা বলিব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—*—

সমরাঙ্গনে।

They hast called me thy Angel in moments of bliss,
And thy Angel I'll be, 'mid the horrors of this,—
Trough the furnace, unshrinking, they steps to pursue,
And shield thee and save thee,—or perish there, too!

Moore.

বিজয়চাঁদ প্রায় যুদ্ধক্ষেত্রের সমীপবর্ত্তী হইয়াছেন, এমন সময় সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন,—সন্মুখে অশ্বপৃষ্ঠে পদ্মাবতী!

বিজয়চাঁদ দেখিলেন, পদ্মাবতী আজ পুরুষের বেশ ধারণ করিয়াছে—অশ্বপৃষ্ঠে রণসাজে সজ্জিত—হস্তে তরবারি!

বিজয় সবিস্ময়ে চীৎকার করিয়া কহিলেন,—"একি এ!

পদ্মাবতি! তুমি এখানে?” পদ্মাবতী আপনার উন্মুক্ত তরবারি তাঁহাকে প্রদর্শন করিয়া কহিল,—“হাঁ, আমি আজ তোমার সহিত এক সঙ্গে মরিব—তাই ছুটিয়া আসিয়াছি।”

বিজয় ত্বরিতে অশ্বের বল্‌গা সংযত করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া উত্তর করিলেন “একি বাতুলতা, পদ্মা!”

পদ্মা! পদ্মা! পদ্মাবতী সে স্বরে শিহরিয়া উঠিল। কত দিন সে এ প্রিয় সম্বোধন শ্রবণ করে নাই। পদ্মা ভাবিল, এ সম্বোধন শুনিয়া মরণেও সুখ। কহিল,—

“বাতুলতা নহে বিজয়, আজ আমি নিশ্চয় মরিব। তুমি আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ—কিন্তু আমিত তোমায় পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। তুমি মরিতে আসিয়াছ; আজ তোমার পতনের পূর্ব্বে আমার পতন হইবে। তোমার সম্মুখে তোমারই পায় মাথা রাখিয়া আজ আমি এ অভিশপ্ত জীবন পরিত্যাগ করিব।”

বিজয়চাঁদ ব্যথিত হইলেন, চিন্তিতও হইলেন। কহিলেন, “পদ্মা, গৃহে ফের। এ সমরাঙ্গন তোমার মত কোমলাঙ্গীর স্থান নহে। মরিতে আজ সবাইকেই হইবে। কিন্তু গৃহে ফিরিয়া সম্মান রক্ষা পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ কর। সমরক্ষেত্রে রমণীর আত্মমর্য্যাদা রক্ষা পাইবে না—গৃহে ফের।”

কিন্তু পদ্মা অচল, অটল। কহিল,—“সে অসম্ভব। আজি শেষবার তোমার চরণে এই অকিঞ্চিৎকর দেহ চিরবিশ্রামার্থ রাখিয়া যাইব বলিয়াই আসিয়াছি, আর ফিরিব না। তুমি চিন্তা করিও না বিজয়। জীবন থাকিতে একটী পিপীলিকাও এ দেহের অমর্য্যাদা করিতে পারিবে না—তুমি আর আমায় বাধা দিও না। এখন শেষ বার আমার একটী অনুরোধ রক্ষা কর। বিদায় কালে——”

বিজয় আর শুনিলেন না। বিজয় শঙ্কিত হইলেন, পদ্মা কোনও অসাধ্যসাধনের অনুরোধ করিয়া বসিবে। তিনি ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন—আর পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিলেন না।

সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া বিজয় দেখিলেন, সব একরূপ শেষ হইয়া গিয়াছে।--সম্রাটসৈন্যগণ ঘন ঘন জয়ধ্বনি করিতেছে, বল্লালসেন হত হইয়াছেন—তাঁহার সৈন্যগণ ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছে।

বিজয় উচ্চস্বরে চীৎকার করিয়া কহিলেন,—"কাপুরুষগণ, ফের্ ফের্, প্রভুর দেহরক্ষা কর্—শেষকালে তাঁহাকে বিদেশীর চরণে লুণ্ঠিত হইতে দিস্ না—আর কিছু না পারিস্, তাঁহার পবিত্র দেহ গৃহে লইয়া চল্।"

বিজয়কে দেখিয়া এবং তাঁহার এই উত্তেজনাপূর্ণ বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া কয়েক জন হিন্দু আবার ফিরিল। কয়েকজন প্রবল বিক্রমে যাইয়া বল্লালসেনের দেহ উত্তোলন করিয়া লইয়া নগরের দিকে অশ্ব ছুটাইয়া দিল। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই শত্রুর আক্রমণে বিনষ্ট হইল।

বিজয় দেখিলেন, হঠাৎ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া কেহ একটা বর্ষা নিক্ষেপ করিতেছে। বিজয় স্বীয় ঢাল দ্বারা তাহা ব্যর্থ করিতে প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু এমন সময় কে একজন তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বুক পাতিয়া সে বর্ষা গ্রহণ করিল। বিজয় চিনিলেন, সে আর কেহ নহে—পদ্মাবতী! বিজয় সকলই বুঝিলেন, সকলই দেখিলেন। একমুহূর্ত্তে তিনি উন্মত্তবৎ অশ্ব হইতে ভূমে অবতরণ করিলেন। অবতরণ করিয়া বিজয় পদ্মাবতীর রক্তাপ্লুত দেহ স্বীয় বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক পুনঃ অশ্বে আরোহণ করিয়া বিদ্যুৎবেগে পশ্চাৎ দিকে

ধাবিত হইলেন। শত্রুর অস্ত্রের আঘাতে তাঁহার দেহ জর্জ্জরিত হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি কিছুই গ্রাহ্য করিলেন না। যত সত্বর সম্ভব তাহাকে লইয়া সমরাঙ্গন হইতে দূরে যাইতে লাগিলেন। তখনও পদ্মাবতীর দেহে প্রাণ আছে। পদ্মাবতী ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিয়া কহিল,—

"বিজয়, বিজয়, ঘোড়া ফিরাও, ঘোড়া ফিরাও—পলাইও না—আমার জন্য কলঙ্ক অর্জ্জন করিও না—শত্রুকে পশ্চাৎ দেখাইও না।"

কিন্তু বিজয় সে কথা শুনিলেন না। তিনি বুঝিলেন, তাঁহাদের পরাজয় হইয়াছে—আর জয় হইবে না। আর চেষ্টা করিয়াও ফল নাই। ভাবিলেন, যুদ্ধ তো জয় হইল না; তবে প্রাণটা একটু পরে বিসর্জ্জন করিলেই বা ক্ষতি কি? তিনি আরও দ্রুত যাইতে লাগিলেন। অনেকদূর যাইয়া বিজয়চাঁদ একটা জলাশয় দেখিতে পাইলেন। তাহার তীরে উপস্থিত হইয়া একটা বৃক্ষের অন্তরালে ছায়ায় পদ্মাবতীকে স্থাপিত করিলেন। বর্ষা পদ্মাবতীর বক্ষে অনেকটা বিদ্ধ হইয়াছিল। বিজয় টানিয়া সে বর্ষা খুলিলেন, তারপর নিজবস্ত্র জলাশয়ের জলে আর্দ্র করিয়া তদ্দ্বারা ক্ষতস্থান আবৃত করিলেন। কিন্তু বৃথা চেষ্টা—বিজয় বুঝিলেন, পদ্মার আর জীবনের আশা নাই। পদ্মাও সে কথা বেশ বুঝিতে পারিল। সে অতি কষ্টে একটু হাসিয়া কহিল,—"ছি বিজয়, তুমি পাগল হইয়াছ? আজ ত সকলকেই মরিতে হইবে—তবে আর এত যত্ন কেন?"

বিজয় কাঁদিলেন। কহিলেন,—"পদ্মা, এতদিন কাঁদি নাই—এখন কাঁদিবার সময় আসিয়াছে। কিন্তু সকল কথা তোমায়

আমি খুলিয়া বলিতে পারিব না—আমার কষ্ট তুমিও বুঝিবে না। এ জন্মে তোমায় আমি কোন রূপেই ত সুখী করিতে পারিলাম না—এখন মৃত্যুকালে যাহাতে একটু তোমায় শান্তিতে মরিতে দিতে পারি, তাহা করিতে কেন আমায় বাধা দিবে? পদ্মা, একার্য্যে আমায় বাধা দিও না।”

পদ্মা আবার একটু হাসিল। কহিল,—“এত শান্তিতে আজ মরিতে পারিব, তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই! বিজয়, তুমি আমার দেহের জন্য চিন্তিত হইতেছ? কিন্তু আমার ক্ষত হৃদয়ের দিকে ত একবারও এতদিন ফিরিয়া চাহ নাই। আজ আমার দেহ ক্ষত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার বিনিময়ে আমার হৃদয়ের ঘা শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। তুমি চিন্তিত হইও না—আমি আজ অতুল শান্তিতে তোমার কোলে মাথা রাখিয়া হাসিতে হাসিতে প্রাণত্যাগ করিব।”

আবার বিজয় অস্থির হইয়া উঠিলেন। আবার তাহার মুখ যাতনাক্লিষ্ট ভাব ধারণ করিল। তিনি কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার পশ্চাতে বৃক্ষের অপর পার্শ্বে কাহার পদধ্বনি শ্রুত হইল। তিনি ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন, একটা লোক সমরক্ষেত্রের অভিমুখ হইতে দৌড়িয়া তাঁহাদের নিকট আসিতেছে।

বিজয় ধীরে ধীরে পদ্মার মস্তক মাটিতে রক্ষা করিয়া তরবারি ধারণপূর্ব্বক আত্মরক্ষার্থ দণ্ডায়মান হইলেন। কিন্তু সে ব্যক্তি তাঁহাকে দূর হইতে দেখিয়াই অভিবাদন করিল। বিজয় বুঝিলেন, এ শত্রু নহে, আপনার লোক। তখন তরবারি কোষবদ্ধ করিয়া আবার নিশ্চিন্ত হইয়া উপবেশন করিলেন; উপবেশনপূর্ব্বক তাহার

প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। লোকটী উপস্থিত হইলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি সংবাদ ?"

লোকটা ক্রমাগত দৌড়িয়া আসিয়াছিল। পরিশ্রমে তাহার মুখ হইতে সহসা কথা বাহির হইল না। সে বিনা বাক্যব্যয়ে একটী কৌটা বিজয়চাঁদের নিকট রক্ষা করিল। হঠাৎ বিজয়চাঁদের একটা পুরাতন কথা মনে পড়িল। তিনি চিনিতে পারিলেন, এ কৌটা তাঁহার পিতা তাঁহাকে মৃত্যুকালে বৎসরান্তে খুলিবার জন্য দিয়া গিয়াছিলেন! নানা গোলযোগ এবং যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে বিজয় ইহার কথা একবারেই বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন। বিশেষ অর্থের জন্য তিনি আর এখন লালায়িত নহেন—তিনি ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার পিতা এই কৌটায় তাঁহাকে কোন অমূল্য মণিমাণিক্যই দিয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং এ বিষয়ে তাঁহার তেমন আগ্রহও ছিল না। এখন শেষমুহূর্ত্তে এই কৌটাটী পাইয়া তিনি ক্ষিপ্রহস্তে উহা উন্মোচন করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তিনি উহাতে মণিমাণিক্যাদি কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তদ্‌পরিবর্ত্তে উহা হইতে এক খণ্ড অতি সযত্নরক্ষিত সংক্ষিপ্ত লিপি বাহির হইয়া আসিল। লিপি বল্কল-নির্ম্মিত। সুতরাং জীর্ণশীর্ণ হওয়ায় অক্ষরগুলি কিছু অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তবু বিজয় তাহা সম্যক্ পাঠ করিতে পারিলেন। পাঠ করিয়া তাঁহার হৃদয়ে বড় চঞ্চলতা উপস্থিত হইল। তিনি অকস্মাৎ একবার সজল নয়নে আকাশের দিকে চাহিয়া পদ্মাবতীকে হৃদয়ে চাপিয়া ধরিলেন। সেই সময় পদ্মাবতীর দেহ অবশ হইয়া আসিতেছিল, দৃষ্টিশক্তি লোপ পাইতেছিল। তবু পদ্মা এক অননুভূত সুখস্পর্শের আবেশে ঈষদ্‌কম্পিত হইয়া উঠিল। তাহার পাংশুবর্ণ অধরযুগলে একটা ক্ষীণ

হাসির রেখা অচিরাৎ ফুটিয়া উঠিল। বিজয় উন্মত্তবৎ বহুকালের সঞ্চিত আবেগটুকু অকস্মাৎ যেন মুক্ত করিয়া দিয়া আপন অধরযুগলে সেই ক্ষীণ হাসিটুকু চুম্বন করিলেন। সেই মধুর হাসিটুকু পদ্মার বদনমণ্ডলে সম্যক্ মিশাইতে না মিলাইতেই তাহার জীবন-প্রদীপ চির কালের জন্য নির্ব্বাপিত হইয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নয়নচাঁদের পত্র।

A doleful story you shall hear
In time brought forth to light ;

Anonymous.

নয়নচাঁদের পত্রের বিষয় জানিতে পাঠকপাঠিকার অবশ্যই আগ্রহ জন্মিয়াছে। সুতরাং এইস্থলে তাহার বিবরণ প্রদান করিব। পত্রখানিতে এইরূপ লিখিত ছিল,—

"বিজয়চাঁদ, আমার মৃত্যুর এক বৎসর পরে তুমি পাঠ করিবে বলিয়া এই পত্রখানি লিখিত হইতেছে। এক বৎসর পরে তুমি যখন এই পত্রখানি পাঠ করিবে, তখন বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইবে সন্দেহ নাই। কারণ সে সময় তুমি তদ্‌পাঠে তোমার জীবনের একটী অতি গুহ্য তত্ত্ব অবগত হইবে।

"বিজয়, তুমি জান, আমি তোমার পিতা, তুমি আমার পুত্র। তুমি কেন, সমস্ত জগৎই এইরূপ জানে। কিন্তু বিজয়, সে কথা প্রকৃত নহে। তুমি শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবে, আমিও তোমার পিতা নহি, তুমিও আমার পুত্র নহ। পশ্চিমপ্রদেশাগত নবদ্বীপবাসী অজয়-

সিংহ নামক জনৈক ক্ষত্রিয় যোদ্ধাই তোমার জনক—কিন্তু তিনিও আজ পরলোকগত।

"বিজয়, অজয়সিংহের মৃত্যুকালে তোমার বয়স দুই বৎসরমাত্র ছিল। তোমার মাতৃঠাকুরাণীর ইতি পূর্ব্বেই কাল হইয়াছিল এবং এ পর্য্যন্ত অজয়সিংহই তোমার লালন পালন করিতেছিলেন। সুতরাং এখন তাঁহার মৃত্যুকালে সংসারে অন্য কোনও আত্মীয় না থাকায় তিনি আমাকেই তোমার ভার অর্পণ করিয়া গেলেন। বিজয়, সেই সময়ে আমি সন্তানলাভে বঞ্চিত, সুতরাং তোমাকে পাইয়া আমি সেই ক্ষোভ বিস্মৃত হইলাম এবং সন্তান নির্ব্বিশেষে পালনপূর্ব্বক জগৎসমীপে তোমাকে আমার সন্তান বলিয়াই পরিচিত করিতে চেষ্টিত হইলাম। সেই অবধি জগৎসংসার জানিল, তুমি জানিলে, আর আমিও বুঝিলাম, তুমি অজয়সিংহের সন্তান নহ—আমারই পুত্র।

"ইহার পাঁচ ছয় বৎসর পরে পান্নার জন্ম হয়। সেই সময় তদ্সঙ্গে পান্নার আর একটী যমজ ভগ্নিও জন্মিয়াছিল। কিন্তু সে অভাগ্য শিশু জন্মের কিয়ৎকাল পরেই প্রাণত্যাগ করে,—সে কথায় আর কাজ কি? পান্নার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে আমার সহ-ধর্ম্মিণীও ইহলোক ত্যাগ করিলেন। হয়ত, এ সব কথা তোমারও কিছু কিছু মনে থাকিতে পারে। ইহার পরই বিজয়-চাঁদ, আমার মনে একটা নূতন সঙ্কল্প জাগিয়া উঠে। বিজয়, দুই বৎসর বয়স হইতে আমি তোমায় লালন পালন করিয়া আসিয়াছি—পুত্রাধিক যত্নে আমি তোমায় এতবড় করিয়াছি—আর জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত এমনি পুত্রাধিক ভাবেই ভালবাসিয়া ও যত্ন করিয়াই যাইব বিশ্বাস আছে। আমার এ আশা কি ফলবতী

হইবে না ? আমি যে সঙ্কল্প করিয়াছি, তাহা আমার জীবদ্দশায় কার্য্যে পরিণত হইলে, এ পত্র তুমি দেখিতে পাইবে না—আমি নিজেই ইহার সমস্ত কথা নিজ মুখে তোমায় বলিয়া যাইব। কিন্তু বৃদ্ধের দেহ আজ উৎকট রোগপীড়িত—কোন্ সময়ে ভবের খেলা সাঙ্গ হয়, তাহার নিশ্চয়তা নাই—আমি যে সে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিয়া যাইতে পারিব, তাহার ভরসা কি ? যাহাতে আমার মৃত্যুর পরও আমার সেই চির-আকাঙ্ক্ষিত কামনা সিদ্ধ হইতে পারে, সেই জন্যই এই লিপি লিখিয়া যাইতেছি।

"বিজয়, পান্না তোমার ভগিনী নহে, একথা জানিতে পারিলে। এখন আমার সে কামনা কি তাহা শ্রবণ কর। আমার বড় ইচ্ছা যে, যে মুহূর্ত্তে তুমি এই কথা জানিতে পারিবে, সেই মুহূর্ত্তেই তুমি আমার একমাত্র দুহিতা পান্নাকে পত্নিরূপে গ্রহণ কর। বিজয়, যদি আমার প্রতি তোমার বিন্দুমাত্রও ভক্তি কিম্বা স্নেহ জন্মিয়া থাকে, তবে এ পত্র পাঠের পর অতি সত্বর শুভদিনে ও শুভক্ষণে আমার এ বাসনা পূর্ণ করিবে। আমি পরলোক হইতে এ কার্য্যের জন্য তোমায় আশীর্ব্বাদ করিব।

"আমার মৃত্যুর পর এক বৎসরের মধ্যে পান্নার কালাশৌচ গত হইবে না। সুতরাং সেই সময়ের মধ্যে তোমাদের পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। এই গুপ্তকাহিনী প্রকাশ পাইলে, পরিণয় না হওয়া পর্য্যন্ত তোমাদের একসঙ্গে বাস করা সঙ্গত হইবে না। তাই যাহাতে এক বৎসর পর্য্যন্ত এই গুপ্তকাহিনী প্রকাশিত না হয়, সেই জন্য সম্বৎসর পরে কৌটা খুলিবার আদেশ প্রদান করিলাম।

পরলোকগত বৃদ্ধের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর।

নয়নচাঁদ।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—*—

অপূর্ব্ব মিলন।

I had a dove, and the sweet dove died ;
And I have thought it died of grieving ;
O, what could it grieve for? Its feet were tied
With a silken thread of my own hands'weaving.
John Keats.

এইরূপে সব শেষ হইয়া গেল। পদ্মাবতীর আত্মা দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাপ্রস্থান করিলে, বিজয়চাঁদ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই পরিত্যক্ত দেহলতিকা আপন বাহুদ্বয়ে জড়িত করিয়া রাখিয়া তাহার সেই কুসুমতুল্য সুকুমার মুখখানার প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। সেই অকালোন্মূলিত কনকলতিকার প্রতি চাহিয়া চাহিয়া ক্রমে তাঁহার হস্তপদাদি অসাড় হইয়া আসিতে লাগিল। তাহার দেহ স্তব্ধ, সংজ্ঞা লুপ্ত এবং নিশ্বাস-প্রশ্বাস ধীর হইয়া আসিল। বিজয়ের মুখে আর বাক্য নাই, নিশ্বাসে উষ্ণত্ব নাই, চক্ষে জল নাই, পলক নাই, চঞ্চলতা নাই; হৃদয় স্থির, ধীর, অকম্পিত! একটী মাত্র ক্ষুদ্র প্রাণের সঙ্গে পার্থিব সুখ-দুঃখ তাঁহার নিকট হইতে চির-অস্তমিত হইয়া গিয়াছে, একটী মাত্র ক্ষুদ্র দেহের অভাবে ইহজগৎ সম্পূর্ণ তাঁহার চক্ষে লীন হইয়া গিয়াছে। তিনি বহুক্ষণ বাহ্যজ্ঞানরহিতভাবে শূন্যদৃষ্টিতে সেই বিগতজীবন শবদেহের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। অনেক দিন এ দেহ দেখেন নাই, অনেক দিন এ দেহ দেখিতে পাইবেন না। কেন? বিজয় ভাবিলেন, মৃত্যুর পরে কি রূপরাশি বিকশিত

হয়? যে রূপ, যে সুকুমার অঙ্গ দেখিয়া বিজয় চরাচর বিস্মৃত হইয়াছিলেন, সে রূপ, সে অবয়ব কি পরলোকেও বিজয়চাঁদ দেখিতে পাইবেন? পরলোকে আত্মাই গমন করিয়া থাকে, জড়দেহের তথায় অস্তিত্ব নাই—বিজয়চাঁদ, সেই অজানিত দেশে পদ্মাবতীর আত্মারই সাক্ষাৎ পাইতে পারেন, কিন্তু তাহার এই ভুবনমোহনরূপরাশি, এই সুকুমার অবয়বের ত এই খানেই শেষ, এই খানেই চিরলোপ! বিজয়চাঁদ তাই চাহিয়া চাহিয়া অনেক-ক্ষণ পর্য্যন্ত কেবলি তদ্‌প্রতি চাহিয়া রহিলেন। বুঝি তিনি অনন্তকাল সেই ভাবেই চাহিয়া থাকিতেন, কিন্তু এই সময় একটা ভীষণ কোলাহল আসিয়া তাঁহার সেই স্থির, ধীর, শুদ্ধ হৃদয়কে অকস্মাৎ বড় আলোড়িত করিয়া দিল। বিজয়চাঁদ এই সময়ে দূরে সমরভূমিতে শত্রুর গভীর জয়োল্লাস শুনিতে পাইলেন।

বিজয় বুঝিলেন, সেই দিন কেবল তাঁহার নিজের নহে, সেই দিন সেই মুহূর্ত্তে সেই বিস্তীর্ণ প্রান্তরে বঙ্গের প্রত্যেক সন্তানের সুখসৌভাগ্যের শেষ আশা-ভরসা চির বিলুপ্ত হইয়া গেল। তিনি বুঝিলেন, সেই জয়নিনাদে বঙ্গের শেষ হিন্দুগৌরব চিরকালের তরে স্রোতস্তাড়িত নির্ম্মাল্যবৎ জলধির অতলগর্ভে ডুবিয়া গেল। তিনি তখন আপন সুখ-দুঃখ ক্ষণ-কালের তরে দূরীভূত করিলেন; এক মুহূর্ত্তের জন্য আপন ভাবনা-চিন্তা বিদূরিত করিয়া দিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর অদূরে উপবিষ্ট সেই আগন্তুককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—

"আজ আমাদের সব শেষ হইল—আজ এই ইহলোক পর-

লোকের সন্ধিস্থলে জীবনের শেষ দিনে কে তুমি আমার এই মহৎ উপকার করিলে ?”

আ। সামান্তপ্রবর, আমি রাজপরিচারক—মহারাজাধিরাজের অনুচর মাত্র—আপনার ভৃত্য।

বি। এ কৌটা তুমি কোথায় পাইলে ?

আ। আপনার ভগ্নি আপনাকে দিবার জন্য আমাদ্বারা ইহা প্রেরণ করিয়াছেন।

বি। তুমি পান্নার কথা কহিতেছ, সন্দেহ নাই। পান্না এখন কোথায় ?

আ। তিনি রাজাবরোধে রাজপুরবাসিনীগণের সহিত বাস করিতেছেন।

বি। ঐ শোন শত্রু জয়ধ্বনি করিতেছে—আমাদের নিশ্চয় পরাজয় হইয়াছে—তাহারা এখন কি করিবে ?

আ। তাঁহারা এতক্ষণ অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া রাখিয়াছেন—পরাজয়ের সংবাদ পৌঁছিবামাত্র আপনাপন দেহ অগ্নিকুণ্ডে ভস্মীভূত করিবেন।

বি। উত্তম। আমি এক্ষণে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইলাম। এক্ষণে যুদ্ধক্ষেত্রে পুনঃগমন করিব। কিন্তু তদ্পূর্ব্বে একটা কর্ত্তব্য আছে। তুমি শীঘ্র ইহার সৎকারার্থে কাষ্ঠাহরণ করিয়া আন। এই স্থানে একটী চিতা রচনা করিতে হইবে।

নিকটেই কতকগুলি বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ ছিল। তখন সেই রাজানুচর তাঁহার আদেশে সেই সকল বৃক্ষ হইতে কতকগুলি শুষ্ক শাখাপ্রশাখা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া সেই স্থানে একটী সুবৃহৎ চিতা রচনা করিল। বিজয়ের আদেশানুসারেই চিতাটী আয়তনে

কিঞ্চিৎ বৃহৎ করা হইল। বিজয় একটী মাত্র ক্ষুদ্র মৃতদেহের জন্য কেন এরূপ একটী বৃহৎ চিতা রচনার আদেশ প্রদান করিলেন, তাহা প্রথমে সেই ব্যক্তির হৃদয়ঙ্গম হইল না। কিন্তু সে কথা বুঝিতে তাহার বড় বেশী বিলম্বও হইল না। বিজয় অবিলম্বেই তাহার কৌতূহল নিবারিত করিলেন। পদ্মাবতীর শীর্ণ দেহ শেষ বার আলিঙ্গন পূর্ব্বক সেই সুবৃহৎ চিতার এক পার্শ্বে উঠাইয়া দিয়া তিনি কহিলেন,—"আগন্তুক, তুমি আজ আমার অনেক উপকার করিলে। আজ তুমি ঈশ্বরপ্রেরিত দূত হইয়া আমার অন্তিমের বন্ধুরূপে এখানে উপস্থিত হইয়াছ, সন্দেহ নাই। কিন্তু এখনও তোমার কার্য্য সম্পূর্ণ সম্পন্ন হয় নাই। আজ তোমায় আর একটী গুরুতর ও অতি মহৎকার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। আমি এখনি যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে প্রস্থান করিতেছি—ঐ শোন শক্রর বিপুল জয়োল্লাসে কর্ণ বধির হইয়া যাইতেছে—আর আমার অপেক্ষা করিবার অবসর নাই—আমি এখনি যাইয়া সেই অনন্ত শক্রসৈন্যমধ্যে মিশিয়া যাইয়া এ ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্র অস্তিত্ব অনন্তের অনন্তস্রোতে মুহূর্ত্তমধ্যে চিরবিসর্জ্জিত করিব—এখনি আমার সর্ব্বস্ব শেষ হইয়া যাইবে। এই নশ্বর দেহ পঞ্চভূতে মিশিবার পূর্ব্বে আমাদের উভয়ের মৃতদেহ আজ তোমায় আর একবার একত্র সম্মিলিত করিয়া দিতে হইবে। বিধাতার নির্ব্বন্ধে ইহজীবনে যে মিলন সংঘটিত হয় নাই, পরলোকের দ্বারদেশে আজ তোমার কৃপায় সে পবিত্র-মিলন সংঘটিত হউক! বন্ধু, আমি এখনি প্রস্থান করিতেছি, তুমি সত্বর চিতায় অগ্নি প্রদান কর, তারপর মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া আমার পশ্চাৎ অগ্রসর হও। ছলে হউক, বলে হউক, কৌশলে হউক, যে স্থানে আমার পতন হইবে, সে স্থান হইতে আমার এই

নশ্বর দেহ উদ্ধার করিয়া এই স্থানে তোমায় আনয়ন করিতে হইবে, তার পর এই বিশাল চিতার অগ্নিস্ফুলিঙ্গগুলি চিরনির্ব্বাপিত হইবার পূর্ব্বেই পদ্মাবতীর শেষ অস্তিত্বের সহিত চিরমিলিত করিয়া দিয়া তোমার আজ উহা ভস্মসাৎ করিতে হইবে। তুমি শ্মশানের বন্ধু, ঈশ্বর প্রেরিত দূত, এই মহৎকার্য্য সম্পন্ন করিতেই নিশ্চিত এখানে তোমার আগমন হইয়াছে—দেখিও যেন আমার শেষ আদেশ অবহেলা করিও না। আদেশ পালন কর—জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করিবেন।"

এই কথা কহিয়া বিজয় ত্বরিতে অশ্বারোহণ করিলেন। সেই অপরিচিত ব্যক্তি অতি কাতর হইয়া কি কহিতে যাইতেছিল, কিন্তু বিজয় তাহাতে বাধা দিলেন। হস্তসঞ্চালনে বাক্য ব্যয় করিতে নিষেধ করিয়া পশ্চাৎ অবলোকন পূর্ব্বক অতি দ্রুত বেগে যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে অশ্ব ছুটাইয়া দিলেন।

তখন যুদ্ধ প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে—সম্রাটের বিপুলবাহিনীর নিকট বঙ্গের হিন্দুমুসলমানের যুক্ত অনিকিনী পরাভূত হইয়াছে। বাহাদুর বন্দী, বল্লাল সেন হত, বঙ্গ-বাহিনী পলায়নতৎপর। বিজয়চাঁদ সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া যথায় বিজয়ী সম্রাটসৈন্যগণ মহোল্লাসে জয়ধ্বনি করিতেছিল, তথায় নক্ষত্রবেগে যাইয়া মুক্ত তরবারি হস্তে লাফাইয়া পড়িলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার উজ্জ্বল অসি শোণিতরঞ্জিত হইয়া ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার শত্রুগণের কতিপয় মস্তক দেহচ্যুত হইয়া ভূলুণ্ঠিত হইল। কিন্তু সে এক মুহূর্ত্তের ব্যাপার মাত্র। সেই এক মুহূর্ত্ত অতিবাহিত হইতে না হইতেই অসংখ্য শোণিতলোলুপ তরবারি অকস্মাৎ তাঁহার মস্তকোপরি উত্থিত হইল; এবং পরক্ষণেই তাঁহার বিশাল দেহও

কুঠারবিদ্ধ শালতরুর ন্যায় অশ্বপৃষ্ঠচ্যুত হইয়া ভূচুম্বন করিল। বিজয়-চাঁদ সেই স্থানে সেই মুহূর্ত্তে প্রাণত্যাগ করিলেন।

কতক্ষণপরে সম্রাট-সৈন্যগণ জয়োল্লাসমত্ত হইয়া সেই স্থান হইতে ইতস্ততঃ প্রস্থান করিলে, ধীরে ধীরে একটী লোক আসিয়া সেই মৃতদেহটী স্কন্ধে স্থাপনপূর্ব্বক, যেখানে পদ্মাবতীর মৃতদেহ অগ্নিসংযোগে 'হু হু' করিয়া ভস্মসাৎ হইতেছিল, সেই দিকে দৌড়িয়া চলিল। পদ্মাবতীর চিতা হইতে তখনও সর্ব্বভুক্ প্রবল হুতাশন পুঞ্জীকৃত ধূমরাশি উদ্গীরণ করিয়া বিমানদেশ স্পর্শ করিতেছিল এবং সে ধূমরাশির সহিত পদ্মার পবিত্র দেহের পবিত্র জ্যোতিঃ ও পবিত্র রেণুকণা তখনও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছিল। সেই লোকটী দ্রুত যাইয়া বিজয়ের মৃতদেহও সেই প্রজ্বলিত অগ্নিরাশির শিখাবিমণ্ডিত বিশাল উদরে নিক্ষেপ করিল। অগ্নি একবার একটু নির্ব্বাপিত হইয়া আবার পরমুহূর্ত্তেই বিপুলগর্জ্জনে 'ধক্‌ধক্' জ্বলিয়া উঠিল। সেই সর্ব্বভুক্, সর্ব্বগ্রাসী অনলের উদরে অনতিবিলম্বেই উভয়দেহ ভস্মসাৎ হইয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

উপসংহার।

Down came the storm, and smote amain
The vessel in its strengths;

H. W. Longfellow.

গেল, গেল—সব গেল! বঙ্গের শেষ হিন্দুগৌরব, বঙ্গের শেষ স্বাধীনতাভাস্কর চির অস্তমিত হইল। বঙ্গের ঐশ্বর্য্য-সম্পদ সুখ-সৌভাগ্য সেই দিন সেই মুহূর্ত্তে বহুশতাব্দীর জন্য এ অভিশপ্ত দেশ হইতে বিদায় গ্রহণ করিল।

বাহাদুর সাহ ও দৌলৎ-উন্নিসা বন্দী হইয়া দিল্লীতে নীত হইলেন। দিল্লীশ্বর তাঁহাদিগকে আবদ্ধ করিলেন সত্য, কিন্তু তাহাদিগের প্রতি কোনও রূপ দুর্ব্ব্যবহার করিলেন না; উপযুক্ত মান-মর্য্যাদাসহ তাঁহাদিগকে বিশেষ আদর যত্ন করিতে লাগিলেন। যাঁহারা ইতিহাস অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন যে কয়েক বৎসর পরে গায়েসুদ্দীন তোগলকের পরবর্ত্তী সম্রাট কর্ত্তৃক এই বাহাদুরই আবার পুনরায় বঙ্গের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজত্ব পাইলেও তখন তাঁহাকে দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করিয়াই তথায় রাজত্ব করিতে হইয়াছিল। সুতরাং সে রাজত্ব প্রাপ্তির সঙ্গেও বঙ্গের স্বাধীনতা ও সুখসৌভাগ্য আর পুনরুদিত হয় নাই।

দিল্লীশ্বর বঙ্গ-জয়পূর্ব্বক বঙ্গের সিংহাসনে সিহাবুদ্দীনকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সম্রাটের

প্রস্থানের পর সিহাবুদ্দীন পূর্ব্ববৎ দিল্লীর অধীনতা স্বীকার পূর্ব্বক গৌড়ে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। যুদ্ধে হাসিম নিহত হইয়াছিল। সুতরাং কেশবলাল এখন সিহাবুদ্দীনের নিকট সুবর্ণগ্রামের আধিপত্য যাচ্ঞা করিল। কিন্তু সিহাবুদ্দীন তাহার প্রার্থনায় যে উত্তর করিলেন, তাহাতে তাহার আশা ভরসা এক মুহূর্ত্তের মধ্যে অকস্মাৎ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। সিহাবুদ্দীন কহিলেন,—"কেশবলাল, তোমার প্রার্থনা সঙ্গত বটে। সুবর্ণগ্রামে তোমার ন্যায্য অধিকার আছে, অবশ্য আমি সে অধিকার তোমায় প্রদান করিব। কিন্তু তৎপূর্ব্বে তোমায় একটী কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে হইবে। তুমি হিন্দু। হিন্দু হইয়া যে হিন্দুর সর্ব্বনাশ করিতে পারিয়াছে, সে যে সুযোগ পাইলেই বিধর্ম্মীর সর্ব্বনাশ করিবে না—ইহা বিশ্বাস্য নহে। সুতরাং হিন্দু হইয়া তুমি মুসলমানের অধীনে এ গুরুতর কার্য্যের ভার পাইবে, এমত প্রত্যাশা করিও না— তৎপূর্ব্বে তোমাকে মুসলমান সাজিতে হইবে। এ প্রস্তাবে তুমি সম্মত আছ?"

কেশবলাল দেখিল, সিহাবুদ্দীনের কূটচক্রান্তে এক ফুৎকারে তাহার আশার কুটীর একেবারে ভাঙ্গিয়া যায়, সুখের স্বপ্ন চিরবিলুপ্ত হয়। তখন সে অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া সিহাবুদ্দীনকে অনেক কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিল। অনেক করিয়া তাঁহাকে কহিল, সে আর কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না। সে পান্নার লোভেই এত সব করিয়াছিল, এখন সে পান্নাও নাই, সুতরাং আর তাহার বিশ্বাসঘাতকতার কারণও নাই—বঙ্গেশ্বর তাহাকে বিশ্বাস করিলে এজন্য কখনও তাঁহাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে না। কিন্তু সিহাবুদ্দীন টলিবার পাত্র নহেন। তিনি অচল, অটল! তিনি তাঁহার পূর্ব্ব

কথাই বজায় রাখিলেন। সেই এক কথা! মুসলমান হও, তবেই সুবর্ণগ্রামের অধিকার পাইবে, নতুবা নহে।

কেশবলাল বড় বিচলিত হইল। তাহার একদিকে ধর্ম্ম, জাত্যভিমান, অপরদিকে রাজ্যলোভ! সে কোন্ দিকে যায়? যে ধার্ম্মিক, তাহার নিকটে ধর্ম্ম বড়; যে অধার্ম্মিক, ধর্ম্মের প্রতি, ন্যায়ের প্রতি যাহার অনুরাগ নাই, স্বজাতির প্রতি যাহার প্রীতি নাই, তাহার ধর্ম্মই বা কি আর জাতিই বা কি? তাহার নিকটে সংসারের সুখ-সম্ভোগই সকল। কেশবলাল বিচার করিতে লাগিল। ক্রমাগত কেশবলাল কয়দিন এই কথাই ভাবিল। অনেক দিনের রাজ্যলোভ! অনেক দিনের চেষ্টা উদ্যোগ! কেশব লাল সে কথা সহজে ভুলিতে পারিল না। রাতদিন সে চিন্তাই করিতে লাগিল। সেই পার্থিব সুখলিপ্সার খরস্রোতে প্রবলবায়ু-প্রবাহমুখে ধূলিকণাবৎ তাহার হিতাহিতজ্ঞান অবশেষে ভাসিয়া গেল। কেশবলাল স্থির করিল সে——

কিন্তু যাক্, সে কলঙ্ককাহিনী লিখিয়া আর এ মসীমুদ্রা কলুষিত করি কেন? আমরা এখানেই গ্রন্থ সমাপ্ত করিলাম।

গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ।

উত্তরপশ্চিম-ভ্রমণ।—মূল্য ১৷০ মাত্র। ইহাতে উত্তর ভারতের যাবতীয় প্রধান প্রধান দর্শনীয় স্থানগুলির বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। কাশী, প্রয়াগ, চুণার, বিন্ধ্যাচল, আগ্রা, ফতেপুর-সিক্রি, দিল্লী, ইন্দ্রপ্রস্থ, মথুরা, বৃন্দাবন, গোকুল, মহাবন, জয়পুর, অম্বর, আজমীর, পুষ্কর, চিতোর প্রভৃতির বিস্তারিত বিবরণ ইহাতে পাইবেন। কোথায় কি ভাবে থাকিতে হয়, কোথায় কি দেখিতে হয়, তাহাদের আধুনিক ও পৌরাণিকতত্ত্ব ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

উড়িষ্যা-ভ্রমণ ও জগন্নাথ-দর্শন।—মূল্য ।৵০ ছয় আনা মাত্র। ইহাতে ভুবনেশ্বর, পুরী, সাক্ষীগোপাল, সীমাচলম্ প্রভৃতি অতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানগুলির এবং চিল্কা হ্রদ, খণ্ডগিরি, উদয়-গিরি ও ওয়ালটেয়ার প্রভৃতি মনোরম দর্শনীয় স্থানগুলির নানা কৌতুহলপূর্ণ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

সাবিত্রী-সত্যবান।—অতি উৎকৃষ্ট কাগজ, ছাপা এবং সুন্দর সুন্দর ছবিসহ প্রাইজের উপযোগী করিয়া অতি সত্বর বাহির করা হইবে। এই পুস্তকের দ্বারা যাহাতে বঙ্গে স্ত্রীপাঠ্য উপহার গ্রন্থের অভাব একেবারে দূরীভূত হয়, তাহার বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে। সাবিত্রী-সত্যবান যেমনই উপদেশপ্রদ, তেমনই সুখ-পাঠ্য। ভ্রাতা, ভগ্নি, স্ত্রী পরিজনকে উপহার দিতে হইলে এমন নীতিপূর্ণ আখ্যা-য়িকা সমগ্র আর্য্যসাহিত্য-ভাণ্ডারে অতি বিরল। আমাদের কুল-

লক্ষ্মীদিগের মনোরঞ্জন করিবার জন্য এবং দৃষ্টি আকর্ষণার্থে প্রভূত সুন্দর সুন্দর ছবি দেওয়া হইয়াছে। বাঁধাই অতি উৎকৃষ্ট।

পট।—এখানি সমাজের পট—উনবিংশ শতাব্দীর সমাজের শোচনীয় চিত্র! কেবল রাজনৈতিক আলোচনাতেই দেশের কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না। সমাজসংস্কারেরও আবশ্যক হইয়াছে। সমাজে কি কি ভয়ঙ্কর দোষ প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহা অঙ্গুলি সঞ্চালনে দেখাইয়া দিবার জন্যই এখানি রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। নাট্যাকারে লিখিত। মূল্য ॥৹ আট আনা মাত্র।

রঙ্গিলা।—গীতিনাট্য। স্বভাব ও সম্পদের দ্বন্দ্ব! মূল্য ।৹ আনা মাত্র।

সুরেন্দ্র নাথ রায়

প্রণীত

গ্রন্থাবলি সম্বন্ধে

অভিমত।

—॰—

ট্টত্তরপশ্চিম ভ্রমণ ১।০

াঙ্গ-বিজয় (সচিত্র এডিসন) ১৲

াবিত্রী-সত্যবান(প্রাইজ এডিসন) ১৷৷০

উত্তরপশ্চিম-ভ্রমণ

সম্বন্ধে মতামত।

Bengalee—14th May, 08.

There is a well-written narrative of the author Babu Surendra Nath Roy's travel in Northern India. The narrative is very interesting from beginning to end and repays perusal. It is written in plain Bengali and not being borrowed from other authors, is full of life. Such books on travel are rather rare in the Bengali language and we congratulate the author on his performance which is a valuable addition to the Bengali literature. The get up of the book is excellent.

The Indian Mirror—Feb 16, 08.

Those who intend to travel naturally want to know something about the places they are going to visit. The book be fore us supplies the intending visitors with information of various kinds about some of the principal places of the North-Western

Provinces. The description is so graphic that the reader almost feels as if he himself is enjoying the scenes. The style, in which the book is written, is exactly suited to the subject dealt with and is very pleasant reading from a literary point of view. The author is to be congratulated on the critical way in which he has acquitted himself.

Indian World—January 1909.

Uattar Paschim Bhraman (Travels in the North-West) is another Bengali book of concidorable merit. The style of the author is catching and the lenguage elegant and homely. We have gone through the work with sustained interest and congratulate the author on his powers of descriptions and sense of proportion and discrimination. It is indeed an wel-come addition to the very limitable range of books of travels hither-to published in the Bengali language.

"মডার্ণ রিভিউ," "সাহিত্য" প্রভৃতি নানাবিধ সাময়িক পত্রের লেখক, নানাবিধ গ্রন্থ-প্রণেতা ও সাহিত্য-পরিষদের সুযোগ্য সভ্য গৌহাটী কটন কলেজের ইতিহাস ও সংস্কৃতের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম, এ, মহাশয় গ্রন্থকারকে লিখিয়াছেন,

বিজ্ঞবরেষু—

আপনার লিখিত "উত্তরপশ্চিম-ভ্রমণ" পাঠ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিলাম। এতন্নিমিত্ত আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আপনাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি, এবং আশা করি আপনার গ্রন্থখানি সর্ব্বত্র সাদরে পঠিত হইবে। আপনি যে সর্ব্বজন-সুপরিচিত নাটক, নভেল ও কবিতার পথে না চলিয়া অপেক্ষাকৃত অক্ষুন্ন ভ্রমণ বৃত্তান্তের বর্ত্মে সঞ্চরণ করিয়াছেন, ইহা বড় গৌরবের কথা। "দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন," কবিবর নবীন চন্দ্রের ভ্রমণ-কাহিণী প্রভৃতি অল্পসংখ্যক মাত্র ঈদৃশ পুস্তক বঙ্গ-সাহিত্যে প্রকাশিত হইয়াছে। আশা করি, আপনি ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থান পরি-ভ্রমণ পূর্ব্বক তদ্বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়া এতাদৃশ গ্রন্থের সংখ্যা পরিবর্দ্ধিত করিবেন।

———

জাহ্নবী—ভাদ্র ১৩১৬।

উত্তরপশ্চিম-ভ্রমণ—শ্রীসুরেন্দ্র নাথ রায় প্রণীত, মূল্য ১।০। গ্রন্থকার কাশী, মির্জাপুর, চূণার, বিন্ধ্যাচল, প্রয়াগ, এটোয়া, আগ্রা, ফতেপুর-সিক্রী, বৃন্দাবন, মথুরা, দিল্লী প্রভৃতি উত্তরপশ্চিমা-ঞ্চল এবং রাজপুতনার ঢোলপুর, জয়পুর, গোয়ালিয়র, অম্বর আজ-মীর, পুষ্কর ও চিতোর পর্য্যটন করিয়া এই পুস্তক খানিতে তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গ্রন্থকারের বর্ণনা কৌশলে পুস্তকখানি কৌতূহলপ্রদ ও মনোজ্ঞ হইয়াছে।

গ্রন্থকারের ভাষায় লালিত্য ও সরলতা আছে। পুস্তকখানি

হইতে দর্শনীয় স্থান সমূহের অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইতে পারা যায়। * *

পুস্তকের প্রারম্ভে সুলিখিত অবতরণিকাটি সকলেরই প্রণিধানযোগ্য। দেশভ্রমণ ব্যতীত শিক্ষার সর্ব্বাঙ্গীন পরিপুষ্টি লাভ যে অসম্ভব, তাহা বলাই বাহুল্য। দেশভ্রমণকালে আমরা বিভিন্ন জাতির সামাজিক আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, শিক্ষাদীক্ষা ও সাম্প্রাদায়িক মত সকল জানিতে পারি। ঐতিহাসিক স্থান সমূহ অতীতের স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া আমাদিগকে কত না শিক্ষা দেয়। এই পুস্তকখানি পাঠে ভ্রমণেচ্ছা বৰ্দ্ধিত করে ও ভ্রমণেচ্ছু পাঠকের ইহা সহচর ও পথপ্রদর্শকের কার্য্য করিবে বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস। পুস্তক খানির বহিঃসৌষ্ঠব মনোরম হইয়াছে।

ঢোলপুরের মহারাণার মেডিকেল এডভাইসার সাহিত্যানুরাগী শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় মহাশয় লিখিতেছেন,

নাইনিতাল
১০।৬।০৮।

"উত্তরপশ্চিম-ভ্রমণ" পাঠ করিয়া পরম প্রীত হইয়াছি। বঙ্গ-ভাষায় ভ্রমণ-বৃত্তান্তের অভাব না থাকিলেও প্রাঞ্জল ও শ্রুতি-মধুর ভাষায় এইরূপ পুস্তক এই নূতন। পুস্তকের প্রতি ছত্রে লেখকের স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতি-প্রীতি প্রতিফলিত হইয়াছে। ইতিহাসানুরাগী নবীন লেখক সময়ে একজন কৃতী লেখক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবেন, এরূপ আশা করা যায়।

বঙ্গ-বিজয় সম্বন্ধে অভিমত।

রাজসাহী সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল এবং কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের বর্ত্তমান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ মহাশয় গ্রন্থকারকে লিখিয়াছেন,—

সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা,

৫।১০।১৯।

মহাশয়,

আপনার লিখিত "উত্তরপশ্চিম-ভ্রমণ" ও "বঙ্গবিজয়" পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছি। আনার লিপি-কৌশল অতিশয় প্রশংসনীয়। আপনার লিখিত গ্রন্থ দুইখানি পাঠ আরম্ভ করিলে, তাহা শেষ না করা পর্য্যন্ত আকাঙ্খা নিবৃত্ত হয় না। ভগবান্ আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন। আপনার দ্বারা বঙ্গভাষার বিশেষ উন্নতির আশা করা যায়। আপনি নব্য লেখক হইলেও আপনার লিখাতে অনেক স্থানে বিশেষ ভূয়োদর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়। ইতি—

স্থানাভাবে সকল মতামতাদি প্রকাশিত করা গেল না।